শেষরাত্রির গল্পগুলো
আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব

সূচিপত্র

গল্পকারের অল্প কথা

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

'শেষ রাত্রির গল্পগুলো' প্রচলিত অর্থে কোন গল্পগ্রন্থ নয়। বলা যেতে পারে একটি গল্পের আসর। এই আসরে লেখক ও পাঠক পরস্পর গল্প করবেন। গল্প করতে করতে আনমনা হবেন। গল্প করতে করতেই চিন্তা-প্রতিচিন্তায় ঋদ্ধ হবেন।

আমি তরুণ। যাদের সাথে পড়ি, তারা তরুণ। যাদের সাথে ওঠাবসা করি, তারাও তরুণ। যারা আমার কবিতা পড়ে, তাদের অধিকাংশ তারুণ্যে উচ্ছল। এই তরুণদের বিশ্বাসী চেতনা ও শুদ্ধাচারী প্রাণনা-কে সজীবতর ও সবুজতর করার জন্যে একটি প্রণোদনা ভেতরে কাজ করে আপনাতেই। নিজে সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি, আবার সেই স্বপ্নে অন্যকে তাড়িত করতে পারলে পুলক অনুভব করি। সেই স্বপ্নকে ছোঁয়ার জন্যে কিভাবে সিঁড়ি নির্মাণ করা যায়, তা নিয়ে ভাবি। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমিয়ে যায় ভাবনাগুলোও। মাঝেমাঝে কলমের নিবের ছোঁয়া পেয়ে ডায়েরির পাতায় তারা জেগে ওঠে। আমি এই ধরনের লেখাগুলোর নাম দিয়েছি 'প্রবন্ধগল্প'। দুই হাজার বারো থেকে দুই হাজার ষোলো; এই পাঁচ বছরে প্রকাশিত 'প্রবন্ধগল্প'গুলো থেকে কিছু লেখা নিয়ে 'শেষরাত্রির গল্পগুলো'র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হোল।

লেখাগুলোর ধরন ও প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য আছে। কখনো হালকা চালে গল্পনির্ভর লেখা, কখনো তথ্যসূত্র ও টীকা-টিপ্পনীতে ভরপুর পুরোদস্তুর অ্যাকাডেমিক লেখার

মতোই। কখনো চোখে পড়বে প্রবন্ধের মোড়কে গল্প বলার কোশেশ। অথবা গল্পের আবহে প্রবন্ধের অবতারণা। এই বৈচিত্র্যের নানা কারণ আছে। যেমন:

- বয়সের ক্রমবিবর্তন ও সময়ের পালাবদলের সাথে নিরীক্ষাপ্রবণ চিন্তা-ভাবনার রূপান্তর প্রভাব ফেলেছে লেখার ক্ষেত্রেও।

- যে ধরনের সাময়িকী/পত্রিকায় লেখাটি ছাপানো হচ্ছে, তার সাথে সাযুজ্য বিচার করে লেখা প্রস্তুত করা।

- কিছু লেখা শুধু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অথবা ব্যক্তিগত ওয়েব-ব্লগের জন্যে লেখা। যেমন: দিনলিপি।

- কোনো কোনো লেখা প্রথমে বক্তব্য ছিলো, অথবা কোনো আড্ডায় অগোছালো আলোচনা ছিলো, পরবর্তীতে লিখিত রূপ দেয়া হয়েছে।

- কিছু লেখা তাৎক্ষণিক পাঠ-প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। এরমধ্যে কিছু আছে কবিতা অথবা কাব্যানুবাদ-নির্ভর; পুরোপুরি অথবা আংশিক।

প্রবন্ধগল্পগুলোর রূপ-বৈচিত্র্যের কারণ মোটামুটি এই পাঁচটি। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার পর সব লেখা একই ধাঁচে সাজানোর এবং একই ছকে বাঁধার ইচ্ছেটা আমি দমিয়ে রেখেছি। সময়, বিষয়বস্তু, পূর্বাপর প্রেক্ষাপট ও উদ্দীষ্ট পাঠকের মনসত্ত্ব—এসবকিছু বিবেচনায় রাখলে প্রতিটি লেখা তার নিজস্ব ধাঁচেই বিশিষ্ট, নিজস্ব ছকেই স্বতন্ত্র। তাই বৈচিত্র্য লোপ না করে লেখাগুলোর চেহারা ও মেজাজ অক্ষুণ্ণ রেখেছি। প্রয়োজনবোধে কোথাও টীকা সংযোজন করেছি।

এই বইয়ের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবন্ধগল্প লেখকের ব্যক্তিজীবন-ঘনিষ্ঠ। জীবন থেকে নেয়া ছোট-বড় অভিজ্ঞতা, ভাবনা ও অনুভূতি এখানে মূর্ত হয়েছে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। *একটি স্বপ্নের বেড়ে ওঠার গল্প, স্বপ্ন যখন পৌঁছে গেলো মঞ্জিলে* ও *স্বপ্নের* উড়াউড়ি, *স্বপ্নের অবশেষ* শীর্ষক ধারাবাহিক তিনটি লেখায় জড়িয়ে আছে হেজাযের মাটির ঘ্রাণ।

বিভিন্ন লেখায় মাঝেমধ্যে কিছু বিদেশী শব্দের ব্যবহার ছিলো। শব্দগুলো যথাসম্ভব বাঙলায়নের চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোথাও কোথাও ঐ শব্দের আবেদনের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, এমন কোনো বাঙলা শব্দ পাই নি, অথবা পেলেও পুরোপুরি মনঃপুত হয় নি। সেক্ষেত্রে উর্ধ্বকমা প্রয়োগ করে শব্দটা অক্ষত রেখেছি। হাদিসের নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে সমাদৃত আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ'র নম্বর

বিন্যাস অনুসৃত হয়েছে। বিভিন্ন লেখার পাদটীকায় সংক্ষেপে লিখিত গ্রন্থগুলোর বিস্তারিত পরিচয় বইয়ের শেষে যুক্ত করা হয়েছে।

যে-কথার উল্লেখ মোটেও বাহুল্য নয়, আমি একজন ছাত্র। জানাশোনার পরিধি খুবই অল্প। ফলত আমার লেখায় অসঙ্গতি অথবা উপস্থাপনায় অপরিপক্বতার ছাপ থেকে যাবে। অনিচ্ছাকৃত সকল ভুলের জন্যে আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। কোনো বিষয়ে সংযোজনী বা সংশোধনীর প্রয়োজন অনুভূত হলে অনুগ্রহ করে আমাকে অবহিত করবেন।

'শেষরাত্রির গল্পগুলো'-তে সংস্থিত হওয়া কোনো লেখা পড়ে আপনার ভাবনার সায়রে ছোট্ট একটা ঢেউ যদি কোনভাবে জেগে ওঠে, তাহলে লেখকের নামটি আপনার দু'আয় স্মরণ রাখবেন।

الفقير إلى عفو ربه
আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব
ফেব্রুয়ারি, ২০১৭
৪৪৫/সি, মীরহাজিরবাগ, ঢাকা-১২০৪
amnazib.1997@gmail.com

শেষরাত্রির গল্পগুলো

শেষ রাত্রির গল্পের আসরে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা গল্প করবো, ফাঁকে ফাঁকে কিছু কথাও বলবো।

প্রথম গল্প শোনার আগে

এক

ধরুন, আপনি কাউকে ভালোবাসেন। খুব, খুউব ভালোবাসেন। আবেগসিক্ত অনুরাগে হৃদয়ে প্রীতিময় দ্যোতনা সৃষ্টি করেন। ভেবে দেখুন তো, আপনার অনেক অনেক প্রিয় ভালোবাসার মানুষটির সাথে আপনি কখন কথা বলবেন? হৃদয়ের অব্যক্ত অনুভূতিগুলো কখন ব্যক্ত করবেন? নিশ্চয়ই একান্তে! তাই না? কোলাহলমুক্ত নিভৃত কোন সময়ে আপনি মন উজাড় করে দিতে পারেন তাকে।

দুই

আপনি বলে থাকেন, 'আমি আল্লাহকে সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসি'। তা-ই যদি হয়, সমস্ত বিশ্ব চরাচর যখন নিঝুম রজনীতে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে, নিঃশব্দের ঢেউ খেলে যায় প্রকৃতির বুকে, নীরবতার ছায়া নেমে আসে পৃথিবীর আঙিনায়; তখন কি ইচ্ছে করে আপনার প্রিয়তম মালিকের সাথে একটু নিভৃতে কথা বলার? হৃদয়ের জমানো ব্যথাগুলো তাঁর কাছে পেশ করার? ইচ্ছে করে

আপনার প্রেমাস্পদকে ভালোবাসার দু-ফোঁটা অশ্রু নিবেদন করার? সমস্ত সৃষ্টি যখন সুখনিদ্রায় বিভোর, তখনই তো প্রিয়তম স্রষ্টার সাথে একান্ত আলাপনের সুবর্ণ সুযোগ!

প্রথম গল্পটি:

গল্পটি আমার এবং আপনার মতোই দু জন ব্যক্তির! আমাদের মতোই রক্তে-মাংসে গড়া দু জন বিশ্বাসী মানুষের! শুনুন তবে:

হুসাইন ইবন আল-হাসান রাত্রিকালীন সালাতের ব্যাপারে একটু উদাসীন ছিলেন। তাই ফুদাইল ইবন 'ইয়াদ একবার হুসাইনের হাত ধরে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কথা বলেছিলেন। সে কথা হৃদয়ের খুব গভীরে রেখাপাত করার মতো।

শোনো হুসাইন! আল্লাহ পূর্ববর্তী অনেক কিতাবে বলেছেন, "যে আমার ভালোবাসা দাবী করে, সে মিথ্যা বলে। যখন রাত নেমে আসে, সে আমাকে ফেলে (কিভাবে) ঘুমিয়ে থাকে! আচ্ছা, প্রত্যেক প্রেমিকই কি তার প্রেমাস্পদকে নিভৃতে পেতে চায় না?[১]"

আপনার অবস্থান?

আপনি ইতোমধ্যেই বুঝতে পেরেছেন, আপনার দাবিতে আপনি সত্যবাদী কি-না। যদি ইতিবাচক উত্তর হয়, আপনি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া আদায় করুন এবং ধারাবাহিকতা ঠিক থাকার জন্যে আল্লাহর কাছে দু'আ করুন।

যদি নেতিবাচক উত্তর হয়, চলুন না, আজ থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, আমি আমার ভালোবাসার দাবীকে সত্য প্রমাণ করবোই ইনশা-আল্লাহ!

আল্লাহ আপনাকে তাওফিক দিন।
থামুন, আপনার জন্যে আরো কিছু গল্প এখনো বাকী!

দ্বিতীয় গল্প বলার আগে

আপনি এরই মধ্যে একটি হাদিস প্রায় সময়ই শুনে আসছেন। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, আবূ হুরায়রার [রা.] বর্ণিত হাদিসটার কথাই বলছিলাম!

---

১ আল-মুজালাসাহ: ১৩২

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন:

"

ফরয সালাতের পরে (মর্যাদা ও ফযিলতের দিক থেকে) সর্বোত্তম হোল শেষ রাতের সালাত।[১]

অতঃপর কী হলো?

হাদিসটি শোনার পর আপনার বিশ্বাসের জমিনে ইচ্ছার বীজ বপন করে ফেললেন। 'আমাকেও এই সালাতে শামিল হওয়া দরকার!'

এর সাথে সাথে জেনে ফেলেছেন শেষ রাতের সালাতে অভ্যস্তদের জন্যে আল্লাহর কাছে সুমহান মর্যাদার কথাটাও। ঐ যে, ইবন 'আব্বাস [রা.] যে হাদিসটা বর্ণনা করেছিলেন!

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:

"

আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত হোল কুরআনের ধারক-বাহক এবং রাত্রিতে 'ইবাদাতকারীগণ।[২]

এবার তো আরো চমৎকার একটা হাদিস পড়ে ফেললেন! জাবির [রা.] বর্ণনা করেছেন যেটা! রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:

"

তোমাদের উচিত রাত্রিকালীন সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করা। কারণ, তা-

- *তোমাদের পূর্ববর্তী সালিহ বান্দাহদের অভ্যাস,*
- *আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম,*
- *পাপ থেকে রক্ষাকারী,*
- *মন্দ 'আমাল সমূহের অপনোদনকারী,*
- *শরীর থেকে রোগ-ব্যাধি উপশমকারী।[৩]"*

---

১ মুসনাদ আহমাদ: ৮৪৮৮

২ শু'আব আল-ঈমান: ২৯৭৭

৩ সুনান আত-তিরমিযী: ৩৫৪৯

তারপর?

আপনার সুপ্ত বাসনার অঙ্কুরোদ্গম হলো। মোটামুটি স্থির হলেন। আত্মবিশ্বাসের পারদ হয়ে গেলো ঊর্ধ্বগামী। কিন্তু বাধ সাধলো আরেকটা সমস্যা। আপনি ঘুম থেকে জাগতে পারছেন না!

আপনার জন্যে দ্বিতীয় গল্পটা

ঠিক এমনই অভিযোগ নিয়ে একজন ব্যক্তি হাসান আল-বাসরী'র [র.] কাছে এসেছিলেন। লোকটি বলেছিলেন, 'আমি অনেক চেষ্টা করেও রাত্রে তাহাজ্জুদের জন্যে ঘুম থেকে জাগতে পারি না। আমার জন্যে কী প্রতিষেধকের পরামর্শ দেবেন?'

হাসান আল-বাসরী খুব অল্প কথায় তাকে সমাধান দিয়েছিলেন:

তুমি দিনের বেলায় পাপ কাজ থেকে দূরে থাকো, তাহলে রাতের বেলা সালাতের জন্যে জাগ্রত হতে পারবে। রাত্রে সালাতে দণ্ডায়মান হওয়াটা অনেক বড়ো মর্যাদার ব্যাপার। আর পাপীকে কখনো এই মর্যাদা দেওয়া হয় না।

অল্প কথা। কিন্তু ওজনটা কতটুকু ভারী, চোখ বন্ধ করে কেবল অনুভব করা যায়। নয় কি?

চূড়ান্ত গল্পগুলো

আপনি মানসিকভাবে প্রস্তুত। আপনার দিনটি আল্লাহর সীমারেখা অতিক্রমের কোনো ছোট উপলক্ষেরও সাক্ষাৎ পায় নি। আলহামদুলিল্লাহ।

এই তো! এ-ই তোওও! আপনি সফল। অভিনন্দন! আপনার জন্যে চূড়ান্ত গল্পের ডালি নিয়ে আমরা অপেক্ষমাণ। তার আগে কিছু পরামর্শ আপনার জন্যে,

» খুব বেশি নয়, আপনি মাত্র আধ ঘন্টার প্ল্যান নিয়ে শুরু করুন।
» মনটাকে শক্ত করে ফেলুন। আত্মবিশ্বাস রাখুন। আল্লাহর ওপর আস্থা রাখুন।
» প্রাথমিকভাবে প্রতিদিন হয়তো সম্ভব হবে না। কোন্ কোন্ দিন আপনার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে, আগেই তা ঠিক করে ফেলুন।
» ব্লগ বা ফেসবুকে অধিক আসক্তি থাকলে আপনার নিজের কল্যাণের জন্যেই সেসবের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়া অনেক বেশি প্রয়োজন। তাহাজ্জুদের সুমহান নেয়ামত পেতে হলে তো সময় অপচয়কারী এ বিষয়গুলো কড়া নিয়ন্ত্রণে

সুমহান নেয়ামত পেতে হলে তো সময় অপচয়কারী এ বিষয়গুলো কড়া নিয়ন্ত্রণে আনার বিকল্পই নেই।

» অযু করে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ুন। আল্লাহর ওপর ভরসা করে অ্যালার্ম দিয়ে রাখুন।

» পর্যায়ক্রমে (ইন শা-আল্লাহ) নিয়মিত অভ্যস্ত হবার চেষ্টা করুন।

তৃতীয় গল্পটি

এই গল্পটা অনেক অ-নে-ক বেশি প্রেরণাদায়ক। আপনার সাথেও হয়তো মিলে যেতে পারে!

'আব্দুল 'আযীয ইবন আবি রাওয়াদ ছিলেন আমাদের মতোই আরেকজন বিশ্বাসী মানুষ। তিনি শেষরাত্রে সালাতের জন্যে উঠতে চাইলে কোমল ও আরামদায়ক বিছানার পরশে কিছুটা পিছুটান অনুভব করতেন।

তারপর কী করতেন জানেন?

বিছানায় হাত বুলাতে বুলাতে বলতেন,

ওহ! কতো নরম আর আরামদায়ক তুমি! কিন্তু জান্নাতের বিছানাটা যে তোমার চেয়েও অধিক কোমল আর আরামদায়ক!

অতঃপর তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন।

সর্বশেষ গল্প শোনার আগে

আচ্ছা, আপনি অনেক খুশি না? আরে আরে, মুচকি হেসে কী লাভ? বলেই ফেলুন, আমরাও একটু শুনি! আপনার হৃদয়ে প্রশান্তির সুশীতল বাতাস স্পর্শ করে যাচ্ছে কী নির্মল স্নিগ্ধতায়!

কিন্তু আমি আপনাকে স্বার্থপর বলি, তা নিশ্চয়ই চান না!

আপনি যদি ভাইয়া হয়ে থাকেন, তাহলে আপুকে বঞ্চিত করবেন কেনো? আর আপুরাই বা কেনো ভাইয়াকে ফেলে সৌভাগ্যের অংশীদার হবেন? চলুন না, দুজনের ভালোবাসার পদ্ম দুটো আল-ওয়াদূদের চূড়ান্ত ভালোবাসার মৃণালেই ফুটিয়ে তুলি!

রাজি তো? আপনাদের জন্যে সুসংবাদ! না, আমার নয়। প্রিয় নবীজির কাছেই শুনুন তবে:

"

আল্লাহ ঐ লোকের উপর রহম করুন, যে রাতে ওঠে, সালাত আদায় করে, তার স্ত্রীকে জাগায় এবং সে-ও সালাত আদায় করে। যদি সে উঠতে না চায়, তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ ঐ মহিলার উপর রহম করুন, যে রাতে ওঠে, সালাত আদায় করে, তার স্বামীকে জাগায় এবং সে-ও সালাত আদায় করে। যদি সে ওঠতে না চায়, তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।[১]

প্রিয়তম মালিকের রহমের ছায়ায় আদৃত হবার এমন সুযোগ হাতছাড়া করে কেউ? আপনি যদি অবিবাহিত হয়ে থাকেন, আপনার জন্যেও দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই! আল্লাহর রহমের চাদরে আবৃত হবার সুযোগ আপনার জন্যেও অবারিত! আপনি যেখানে পড়ছেন, যেখানে থাকছেন — মোটের ওপর আপনার আয়ত্তের ভেতরে, হাতের চারপাশের পরিবেশটাকেই জান্নাতী সাজে সাজিয়ে তুলতে পারেন। খুব প্রিয় বন্ধুটির হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তাকেও আপনার পবিত্রতম অনুভূতিটির কথা জানাতে পারেন। অথবা আপনার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যিনি বা যারা আপনার খুব কাছের, তার সাথে এই অনুভব ব্যক্ত করতে পারেন। আপনার রুমমেটদেরকে পর্যায়ক্রমে অভ্যস্ত হওয়ার প্রেরণা দিতে পারেন। দেখবেন, ঠিকঠাক মত এক ডোজ পেয়ে গেলে হয়তো আপনার চেয়েও তারা অধিক যত্নবান হয়ে উঠবেন ইন শা-আল্লাহ। এতে করে হবে কউ, আপনার কখনো তাহাজ্জুদের সুযোগ ছুটে গেলে তাঁরা আপনাকে জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করবেন। অথবা কখনো পিছুটান অনুভব করলে আপনাকে টেনে নেবেন তাঁদেরই কেউ।

চতুর্থ গল্পটি

গল্প নয় শুধু, আমরা প্রেরণা-উজ্জীবনী ও প্রাণনা-সঞ্জীবনী চমৎকার একটি কবিতার সাথে পরিচিত হবো ইনশা-আল্লাহ।

আল্লাহর ভালোবাসায় নিবেদিতপ্রাণ আরেকজন মানুষ, যিনি তাহাজ্জুদের সালাতের জন্যে নিজেকে প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দিতেন একটি কবিতা আবৃত্তি করে; আমরা

---

১ সুনান আবূ দাউদ: ১৩১০; সুনান নাসাঈ: ১৬১০; মুসনাদ আহমাদ:৭৪০৪

সেটার কাব্যানুবাদ করবো। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের তালে আমরা কবিতাটি উপভোগ করবো।

ঘুমের তৃপ্তি তোমাকে ভুলিয়ে রেখেছে প্রকৃত আয়েশ থেকে
জান্নাতী ফুলবাগে শয্যার সুখ থেকে ঠিক গাফেল রেখে
অনন্তকাল বাঁচবে যেখানে, মৃত্যু পাবে না তোমার ছোঁয়া
প্রভুর পক্ষ থেকে নেয়ামত, যাবে না তা থেকে একটু খোয়া!
তাই বলি, জেগে ওঠো তাড়াতাড়ি, অশ্রু ঝরাও, তোলো দু হাত
ঘুমে নয় ভাই, আজকে না হয় কুরআন বুকেই কাটুক রাত।[১]

সুবহানাল্লাহ! কতো সুন্দর 'সেলফ রিমাইন্ডার'!
আমরাও কি পারি না নিজের সাথে এভাবে কথা বলতে?

আসর এখানেই শেষ!

শেষ রাত্রির গল্পের আসরের পর্দা আজ এখানেই নামলো!
এবার গল্প বলার পালা আপনার।
আপনার ভালোবাসার গল্পটি সোনালি হরফে লিখিত হোক আরশের খাতায়।

---

১ মূল কবিতা: ফাদ্বলু কিয়ামিললাইল, আবূ বাকর আল-আজুররী, পৃ.৯

আক্ষেপের গল্প

আজকের আসরে শুধুই আক্ষেপের গল্প। আসর শুরু করার আগে জেনে নেই, [এক] অংশে আমরা কিছু গল্প শোনাবো, [দুই] অংশে তার বাস্তব রূপ দেখবো, [তিন] অংশে পূর্বোক্ত দুই অংশ নিয়ে আমাদের অনুভূতি ব্যক্ত করবো।

এক

শুরুতেই আপনার যাপিত জীবনে চিরাচরিত এবং চিরপরিচিত কিছু আক্ষেপ ও খেদোক্তির সাথে একটু নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেই।

(ক) দুই বছর ধরে ব্যবসায় ক্রমাগত 'লস' খেতে হচ্ছে শফিক সাহেবকে। সবাই এ-কথা ও-কথা বলেন। কিন্তু সবই কাটা গায়ে নুনের ছিটার মতো লাগে তাঁর কাছে। ছোট ছেলের সাথে এ নিয়ে একটু কথা বলার জন্যে বসলেন তিনি। কিন্তু ছেলেটাও নির্লিপ্ত। শফিক সাহেব সেই মুহূর্তে চরম হতাশায় আচ্ছন্ন, ছেলের সাথে কথা বলতে বলতে তাঁর মেজাজ একেবারে সপ্তমে চড়লো। সহসা সোফা থেকে ছলকে দাঁড়িয়ে খুব আক্ষেপের সাথেই বললেন

'আর পারি না! মনডায় কয় মাটি দুইভাগ কইরা আমি এখনি মাটির ভিত্রে ঢুইকা যাই!'

(খ) এই এলাকায় রাজু এবং সাব্বির অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে সবার কাছে পরিচিত। তাদের প্রাণোচ্ছল বন্ধুত্বে কেউ কেউ ঈর্ষাও করে। সুখ ও শোক পরস্পরে ভাগাভাগি করে নেয় দুজনে। ইদানীং অবশ্য রাজুর মধ্যে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করছে সাব্বির।

ছেলেটা হঠাৎ করে ধূমপায়ী হয়ে ওঠছে, আচার-আচরণেও অস্বাভাবিকতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সাব্বির খুব করে বোঝাতে চেষ্টা করে তাকে। সুস্থ-সুন্দর জীবনাচারে ফিরে যাবার তাগাদা দেয়। কিন্তু পেরে ওঠে না। আবার বন্ধুত্বের বন্ধনও সে ছিন্ন করতে পারে না। এদিকে রাজু মাদকাসক্ত-ই হয় নি শুধু, এলাকায় মাদক সরবরাহের কাজটাও খুব দক্ষতার সাথে করছে। সাব্বির বন্ধুর এই পরিণতিতে মর্মাহত হয়। ঠিক এমন সময়েই রাজু হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে আসে, 'সাব্বির, দোস্ত! আমারে একটু হেল্প করবি?' কিছুক্ষণ কী জানি ভেবে সাব্বির মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। রাজু ভরসা পায়, 'দোস্ত! এই বড়িগুলা তোর কাছে একটু লুকায় রাখবি। আব্বা আমারে দৌড়ানি দিতাছে।' বন্ধুর বিপদে সাব্বির না করতে পারে না। পরদিন বিকেলে মাদক সহ পুলিশের হাতে ধরা খেল রাজু। পুলিশ ইনভেস্টিগেশনে রাজুর মাদকচক্রের ব্যাপারে যেসব তথ্য-উপাত্ত উদ্ধার হয়েছে, তাতে সাব্বিরের নামটাও চলে এসেছে। পুলিশ তাকেও খোঁজাখুঁজি করছে। খবরটা শোনার পর থেকে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করছে সে। নিজেকে এতটাই অসহায় বোধ করে নি কখনো। বাবা-মাকেও বলা যাচ্ছে না। রাগে-ক্ষোভে-অপমানে মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে তার মুখ থেকে বেরোয় খেদোক্তি:

'ধুর শালার! উজবুকটার লগে দোস্তি না করলেই হইত! হালার লগে বন্ধুত্ব করতে যায়া আমি এহন মাইনকা চিপায়!'

(গ) খানবাড়ির ছোট ছেলেটা হঠাৎ করেই পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হবার উপক্রম। এলাকায় উঠতি এক কবিরাজ ছিট্টু মিয়া, খান সাহেবকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্থিতধী করালো যে, তার নির্দেশনামত নিয়মিত চিকিৎসা করালে রোগী সুস্থ হয়ে যাবে। অদ্ভুত সব চিকিৎসা পদ্ধতি ছিট্টু মিয়ার। ঝাড়ু দিয়ে পেটানো, মাটি খুঁড়ে অর্ধদেহ তাতে পুঁতে রাখা, আরো আরো কত কী! মোল্লাবাড়ির মুঈন সাহেব এই খবর পেয়ে শুরু থেকেই খান সাহেবকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন এ জাতীয় কুসংস্কার ও বায়বীয় চিকিৎসায় বিশ্বাস না করতে। সময়ক্ষেপণ না করে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে ছেলেকে নেয়ার জন্যে তাগাদা দিতে থাকেন প্রায় সময়ই। খান সাহেবের কানে পানি ঢোকে না, তাঁর মন-মগজে ভালো করে গেঁথে আছে বিবি সাহেবার সেদিনকার কথা, 'হুইনছেন নি! আমগো ছিট্টু কবিরাজ স্বপ্নের মইদ্যে অষুধ পাইছে! পাগলা-ছাগলা হইলেও মানুষডা কিন্তু কামেল!' খান সাহেবের মনে কথাটা কেন জানি ধরেছে খুব করে! স্বপ্নে পাওয়া ঐশ্বরিক অথবা মহাজাগতিক ওষুধের কারিশমায় ছেলের দ্রুত সুস্থতার স্বপ্ন দেখেন তিনি। কিছুদিন যেতে না যেতে ছেলের অবস্থা

ক্রমাগত অবনতির দিকেই যেতে থাকে। খান সাহেব দিশেহারা হয়ে পড়েন। ছিটু মিয়ার ওপর আস্থাটা ক্রমশ ফিকে হতে থাকে। প্রতিবেশীর গোবেচারা ছেলেটার এই মর্মন্তুদ অবস্থায় মুঈন সাহেব আর ধৈর্য ধরতে পারেন না, একপ্রকার জোর করেই খান সাহেবকে সাথে নিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে ছুটে যান পাশের হাসপাতালে। ডা. হাসান এলাকায় খুব নামকরা চিকিৎসক। এমবিবিএস পাশ করে সেই যে চেম্বার বসিয়েছেন এখানে, গ্রামের মায়া আর ছাড়তে পারেন নি। মুঈন সাহেব সবকিছু খুলে বললেন। ডাক্তার খুব অবাক হলেন। খান সাহেবকে এরূপ নির্বুদ্ধিতার জন্যে ভর্ৎসনা করলেন। হাতে ধরে ছেলেটাকে এমন পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার জন্যে উষ্মা প্রকাশ করলেন তিনি। এক পর্যায়ে কালবিলম্বের দরুন রোগীর অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতির আশঙ্কাটা যখন জানালেন, খান সাহেব তখন টেবিলে মাথা খুঁটতে থাকেন। অনেক দূর থেকে তার সশব্দ রোদনধ্বনি শোনা যায়,

'হায় হায় রে! আমি যদি শুরু থেকেই মুঈন সাহেবের কথা শুনতাআআআম....!'

(ঘ) এই ক্লাসে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুটো চিত্র দেখা যায়। এই যেমন, এখন টিফিন ব্রেক চলছে। হালকা নাস্তা করেই বেশিরভাগ ছাত্র ক্লাসে চলে এসেছে। আবিদ, শরিফ এবং মেসবাহ তিন বন্ধু; ওরা এক কোণায় বসে কথা বলছিলো নিজেদের মধ্যে। তিনজনে প্রায়-ই গ্রুপ স্টাডি করে। আজকে কথা হচ্ছিলো বাংলা দ্বিতীয় পত্র নিয়ে। 'সমাস' নিয়ে শরিফের কিছু অস্পষ্টতা আছে। আবিদ আর মেসবাহ মিলে বিষয়গুলো খোলাসা করছে। আরেক কোণায় রাফি, আসিফ এবং ইশতিয়াক; এই তিনজন সারাক্ষণই ভিডিও গেম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এখনও তার ব্যত্যয় হচ্ছে না। কানে ইয়ারফোন গুঁজে দিয়ে রাফি ইতোমধ্যে ইউটিউব সাবস্ক্রাইব করছে, তার প্রিয় চ্যানেলে নতুন কোনো মিউজিক ভিডিও আপলোড হোল কি-না খুঁজে দেখছে। ইশতিয়াক ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করে। আসিফ ইয়ারফোনের এক প্রান্ত নিজের কানের কাছে নেয়।

এই দুই বিপরীতধর্মী দৃশ্য নজরে পড়ে দুজন নবাগত ছাত্রের। এদের একজন রাতুল, আরেকজন সিয়াম। রাতুল বরাবরই রাফিকে শুরু থেকে খেয়াল করে আসছে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করার পরিকল্পনাও নিয়ে রেখেছে। যথারীতি কদিনের মধ্যেই সে তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে ওঠলো। সিয়ামের ওসবে আগ্রহ নেই। আবিদ, শরিফ আর মেসবাহ'র পড়াশোনাকেন্দ্রিক ব্যস্ততা তাকে বরাবরই চমৎকৃত ও অনুপ্রাণিত করে। এই কিছুদিন আগেও সে Right Form of Verbs এর কিছু নিয়ম খুব কঠিন মনে করতো, ওরা তিনজন কী সুন্দর করেই না বুঝিয়ে দিলো! ওদের হৃদয়ের

...শস্ত্য সিয়ামকে আশ্বস্ত করে। ওরাও নতুন একজন পড়ুয়া বন্ধু পেয়ে ভীষণ ...। ইতোমধ্যে ফার্স্ট সেমিস্টার পরীক্ষার রেজাল্ট এসেছে। একই স্কুল থেকে পড়ে আসা, প্রায় কাছাকাছি মার্কস নিয়ে রেজাল্ট করে আসা দুই বন্ধু — রাতুল এবং সিয়ামের প্রাপ্ত মার্কসে এবার বিশাল পার্থক্য। রাতুল কোনো কোনো বিষয়ে 'পাস মার্ক'ও তুলতে পারে নি। সিয়াম অর্থনীতি প্রথম পত্র ছাড়া বাকি সব বিষয়েই ৯০ এর অধিক নাম্বার পেয়েছে। নোটিশ বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে রাতুল নিজের এবং বন্ধুর নাম্বার পাশাপাশি মিলিয়ে দেখে বুকের বাম পাশে একটা ধাক্কা খেলো। মাথাটা কেমন ঘুরে ওঠে তার! মুখ ফুটে বলে ফেলে:

'আহারে! আমিও যদি ওদের সাথে থাকতাম! আজকে রেজাল্টটা কত্ত ভালো হতো আমার!'

(ঙ) সাকিব এবং আকিব- দুইজন জমজ ভাই। উভয়ের মধ্যে কিছু মিল যেমন আছে, অমিলও কম নয়। মিলটা কেমন? যেমন, দুইজনেই প্রচণ্ড স্বাধীনচেতা। এমনকি চাকরি-বাকরিতেও আস্থা নেই, এটাকে 'সভ্য দাসত্ব' বলে উড়িয়ে দেয়। দুইজনেই ঠিক করেছে, পড়াশোনা শেষ করে স্বাধীনভাবে এবং সততার সাথে ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করবে। এ তো গেলো মিলের কথা। অমিলও আছে। প্রথমজন বেশ বুদ্ধিমান। অহেতুক সময় অপচয় যেমন করে না, দুইহাতে পয়সাও খরচ করে না। আবার কার্পণ্যতেও সে নেই। এক কথায় সবকিছুতেই হিসাবী। কিন্তু দ্বিতীয়জন কিছুটা উড়নচণ্ডী। জীবন নিয়ে অতকিছু সে ভাবে না। টিউশনি করিয়ে যে টাকা পায়, খাওয়া-দাওয়া আর ঘোরাঘুরিতে সে তার পুরোটাই উড়িয়ে দেয়। দুজনে ছাত্রজীবন শেষ করেই যখন ব্যবসায় নামার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সাকিব জমানো টাকা হিসেব করে বুঝতে পারে, একটা ভালো পরিমাণ মূলধন দিয়ে সে সুন্দর মতো ব্যবসা শুরু করবে। কিন্তু আকিবের হাত শূন্য। ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তার আক্ষেপ ঝরে পড়ে,

'ইশশশ! জীবনের এই পর্যায়টার জন্য কিছু টাকা যদি জমিয়ে রাখতাম!'

দুই

এবার যে আক্ষেপের গল্পগুলো আপনার সামনে উপস্থাপন করবো, প্রতিটি আক্ষেপ এবং আফসোসের উক্তি উপরের ঘটনাগুলোর সাথে ক্রমানুপাতে মিলিয়ে নেবেন। এতক্ষণ আমরা এপারের আক্ষেপগুলোর কথা জানলাম। এবার ওপারের আক্ষেপগুলোর কথাও একটু জেনে নেই। কেমন হবে সেই খেদোক্তিগুলো? সেই

আফসোসগুলো? আমরা গল্প বলবো না, আল-কুরআনের কাছ থেকেই শুনবো সেসব। উপরের গল্প পুনরায় একটা একটা করে পড়ুন, আর তার সাথে নিচেরগুলো মিলিয়ে নিন।

(ক) শফিক সাহেবের মতো আরো অনেকেই নিজেদের শোচনীয় পরিণতির মুখোমুখি হয়ে সেদিন এমন আক্ষেপ করবে। তাঁরা বলবে:

يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا

"হায়, আফসোস! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।[১]"

(খ) সাব্বিরের মতোই সেদিন আরো কিছু লোক অসৎসঙ্গের পাল্লায় পড়ে স্বকীয়তা হারিয়ে, বিশ্বাসের শুভ্রতায় কালিমা লেপনের কলঙ্কে দিশেহারা হয়ে বিপথগামী হবার আক্ষেপকে প্রকাশ করবে:

يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا

"হায় আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।[২]"

(গ) মুঈন সাহেব বারবার সতর্ক করার পরও গা-ছাড়া মনোভাব নিয়ে নিজের বিপদ ডেকে এনে খান সাহেব যেমন মর্মযাতনায় ভুগেছেন, তেমনিভাবে পার্থিব জীবনের মরীচিকার পেছনে ছুটতে ছুটতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের [ﷺ] পথনির্দেশনা কানে না নেওয়ার দরুন সেদিন অনেকেই নিজের মর্মযাতনা নিশ্চিত করবে। সেই মর্মযাতনার সাথে আবার যুক্ত হবে দৈহিক শাস্তি ও যাতনা। বৃথা আক্ষেপে তারা বলবে:

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا

"যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখমন্ডল ওলট পালট করা হবে; সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও রাসূলের আনুগত্য করতাম।[৩]"

(ঘ) অধ্যবসায়ী ও নিয়মানুবর্তী সহচরদের সাথে থেকে সিয়াম ভালো রেজাল্ট

---

১ সূরা আন-নাবা ৭৮:৪০

২ সূরা আল-ফুরকান ২৫:২৮

৩ সূরা আল-আহযাব ৩৩:৬৬

করেছিলো, অমনোযোগী ও অনিয়মানুবর্তী সহচরদের সাথে সময় কাটানোর কারণে রাতুলের রেজাল্ট হয়েছিলো খারাপ। রাতুল যে আক্ষেপটা করেছিলো, সেদিনও কিছু মানুষ এমন আক্ষেপ করবে:

يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا

"হায়! আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে আমিও যে দারুণ সাফল্য পেতাম![১]"

(৩) জীবনের সঙ্গিন মুহূর্তের জন্যে আগেভাগে সঞ্চয় না করায় আকিবের মনে যে দুঃখবোধ ও আক্ষেপের জন্ম হয়েছে, সেদিনও কিছু মানুষের মুখ থেকে আসল গন্তব্যের জন্যে কিছু সঞ্চয় না করার আক্ষেপবোধ এভাবেই প্রকাশিত হবে:

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

"সে বলবে: হায়! এ জীবনের জন্যে আমি আগেই যদি কিছু পাঠিয়ে রাখতাম![২]"

তিন

দুটো অংশ আরেকবার একটু মিলিয়ে পড়ুন। একটা জিনিস খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন, দুই ধরনের আক্ষেপ প্রকাশের উক্তি কিন্তু একই। কিন্তু দুটোর মাঝে মৌলিক যে পার্থক্যটা, সেটা হচ্ছে, প্রথম দিকের আক্ষেপগুলোর মূল্য আছে, দ্বিতীয় অংশের আক্ষেপগুলোর কোনো মূল্য নেই। এক পয়সারও না! এ আবার কেমন কথা? আচ্ছা, খোলাসা করে বলা যাক।

» শফিক সাহেব যখন আক্ষেপ করে এই উক্তিটা করছেন, তখন কিন্তু তার সামনে এখনো সুযোগ আছে ব্যবসার 'পলিসি ডেভেলপ' করে এই 'লস খাওয়া' থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার।

» সাব্বির যখন তার অসৎ বন্ধুর সাথে বন্ধুত্বের জন্যে আক্ষেপ করছে, তখন তারও সুযোগ আছে, সামনে থেকে বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক হবার।

---

১ সূরা আন-নিসা ৪:৭৩

২ সূরা আল-ফাজর ৮৯:২৪

» খান সাহেব যে শিক্ষাটা পেয়েছেন এবার, সামনে থেকে সে ব্যাপারে সাবধান থাকার জন্যে নিশ্চয়ই তিনি প্রতিজ্ঞ হতে পারেন, সে সুযোগ তার আছে। আবার আল্লাহ চাইলে ওই পরিস্থিতিতেও তাঁর ছেলেকে সারিয়ে তুলতে পারেন।

» রাতুল এবার খারাপ রেজাল্ট করে যে আক্ষেপ প্রকাশ করছে, তারপরে কিন্তু সুযোগ আছে, সিয়ামের মতোই পড়ুয়াদের সাথে সময় কাটিয়ে পরের সেমিস্টারে রেজাল্টটা ভালো করার।

» আকিবের জন্যেও সুযোগ ও সময়ের দরোজা খোলা আছে, এখন থেকেই জীবনটাকে নিয়ন্ত্রিত ও হিসেবী করে, সামনের সময়ের জন্যে সঞ্চয় করার যথেষ্ট সুযোগ আছে তার।

কিন্তু!

» কিয়ামতের দিন মাটি হয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেও কোনো পাপীর সুযোগ নেই মাটি হয়ে যাবার। কিংবা ফিরে এসে জীবনটাকে বদলে ফেলার! আছে সুযোগ? নেই!

» একইভাবে, অসৎ ও পঙ্কিলতাপূর্ণ বন্ধুত্বের দরুন জান্নাতের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া মানুষগুলো যখন তার বন্ধুত্বের জন্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে, তখন তারও সুযোগ নেই সংশোধনের! আছে কি? নেই!

» আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের [ﷺ] কথাগুলো না মানার ফলস্বরূপ মর্মযাতনা ও দৈহিক যাতনার শাস্তি থেকেও ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই সেদিনের আক্ষেপকারীদের। তা-ই নয় কি! হ্যাঁ, তা-ই!

» দ্বীনের পথে সহযোগী, দ্বীনের পথে সহচর, দ্বীনের জ্ঞানে সমৃদ্ধ অথবা দ্বীন পালনের প্রচেষ্টারত মানুষগুলোর সংস্পর্শকে তুচ্ছজ্ঞান করার পর অন্ধকারের যাত্রীদের সহযাত্রী হয়ে সেদিন যাঁরা আক্ষেপ করবে, তাঁদেরও কিন্তু কোন সুযোগ নেই আবার আলোকিত মানুষগুলোর সঙ্গী হবার! আছে বলে মনে হয়? না, একটু-ও না!

» চূড়ান্ত গন্তব্যের জন্যে নিজের সঞ্চয়ের ঝুলি খালি রেখে যাওয়া মানুষগুলোরও একই অবস্থা! অতটুকু আক্ষেপ তাঁকে পুনরায় নতুন করে সঞ্চয়ের সুযোগ করে দেবে না!

এই আক্ষেপগুলো তাহলে কেন আল-কুরআনে বলা হোল? যদি এসবের কোন

মূল্য-ই না থাকে!?

কে বলেছে কোনো মূল্য নেই!?

দেখুন.. শফিক সাহেব, সাব্বির, খান সাহেব, রাতুল, আকিব — এদের কাউকেই কিন্তু আগেভাগে কেউ তাদের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় নি। কাজেই তারা যে শিক্ষাটা পেয়েছেন, তা থেকে নিজেকে সংশোধনের সুযোগ গ্রহণ করে নিতে পারছেন।

কিন্তু আল্লাহ আপনাকে ভালোবেসে আগেভাগেই এমন আক্ষেপ ও অনিবার্য পরিণতির কথা বলে দিচ্ছেন! সাবধান হয়ে যাবার সুযোগ করে দিচ্ছেন আগে থেকেই! তবুও যদি সেই আক্ষেপটা আপনাকে সেদিন করতেই হয়, তবে আপনার চে' দুর্ভাগা আর কে আছে? আপনাকে যেহেতু আক্ষেপ করা থেকে মুক্ত থাকার সব রকম সুযোগ ও সময় দেয়া হয়েছে, প্রস্তুতির উপায়-উপকরণ বাতলে দেয়া হয়েছে, কাজেই সেদিন আপনার সুযোগ ও সময়ের দরোজাটা অনিবার্যভাবেই বন্ধ হয়ে যাবে!

চলুন, তাহলে ভাবি।

নিজের সাথে কথা বলি।

জাগো গো ভগিনী

আম্মু একবার প্রসঙ্গাক্রমে বলেছিলেন, 'আমার ছেলে পাগল হলেও মাথা ঠিক আছে।' কথাটা একেবারে অস্বীকার করবার মতো নয়। মাঝে মাঝে মাথায় যে বিচিত্র ঝোঁক হঠাৎ চাপে, তাতে আম্মুর মন্তব্য ঠিক না হয়ে যাবে কই?

ডায়েরিতে ভালোবাসার মানুষদের একটা তালিকা আছে আমার কাছে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক মানুষের সাথে আমার কখনো সাক্ষাত হয় নি, কিংবা কথাও হয় নি! অনেককে তো জানানোই হয় নি ভালোবাসার কথা। তালিকায় মাঝে মাঝে সংযোজন হয়, তবে বিয়োজনের কোন 'অপশন' খোলা নেই এখানে।

একবার মাথায় আসলো কী, আমার ঈর্ষার মানুষদেরও একটা তালিকা হওয়া প্রয়োজন। যেই ভাবা সেই কাজ। তখন দশম শ্রেণিতে পড়ি। ডায়েরিতে একটা পাতার উপর সাইন পেন দিয়ে শিরোনাম লিখলাম: *'আমি যাঁদের ঈর্ষা করি'*। ইতিহাস ক্লাসে স্যার সীরাতের ওপর আলোচনা করছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর আমি খুব তাড়াতাড়ি ডায়েরি খুলে সেই পাতার শুরুতে লিখে ফেললাম:

১। খাদীজা বিনতু খুয়াইলিদ [রা.]

সামনের সারিতেই ছিলাম আমি। স্যার এদিকে খেয়াল করে কিছুটা অপ্রস্তুত হলেন। এতক্ষণ যে খাতায় নোট করছিলাম, সেটা বাদ দিয়ে হঠাৎ ডায়েরি খুলতে দেখে স্যার মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'দেখতে পারি কবি সাহেব?' আমি এগিয়ে

দিলাম। স্যার পড়ে শোনালেন:

আমি যাঁদের ঈর্ষা করি

১। খাদীজা বিনতু খুয়াইলিদ [রা.]

কেনো এই ঈর্ষা?

বলছি!

তার আগে একটু গল্প করি। জীবনের গল্প। সত্য গল্প।

তখন ক্লাস থ্রি-তে পড়ি আমি। আব্বুর স্বপ্নের স্কুল 'আল-ইহসান একাডেমি' তখন ফুল্ল-ফুলেল হতে শুরু করেছে। চারপাশের জগৎটাকে কিভাবে দেখতে হয়, শেখাতে শুরু করেছেন আব্বু। বিকেল বেলা বাড়ির ছাদে আব্বু, আমি আর রুবাইয়া — তিনজনের আড্ডা হতো। পিঁয়াজ-তেলে মুড়ি ভাজা নিয়ে এসে আম্মুও যোগ দিতেন মাঝেমধ্যে। আড্ডা বলতে আব্বুর গল্প বলা, সাথে নিয়ে আসা নতুন কোনো ম্যাগাজিন বা বইয়ের চমকপ্রদ অংশটা আমাদের পড়ে শোনানো— এই তো। দুয়েকটা বাড়ি ছাড়া তেমন কোথাও টিভি ছিলো না। মোবাইল ফোন আগমনের কথাবার্তা আশেপাশে শোনা যাচ্ছিলো, তবে আমাদের বাড়িতে আসে নি তখনো। অবসর কাটানোর জন্যে বই ছাড়া অন্য কোন উপায়-উপকরণের সাথে আমাদের তখনো পরিচয় ঘটে নি। কত চমৎকার ছিলো আমাদের সেই সুনির্মল-সুবিমল বিকেলগুলো!

যা-ই হোক, সেই আসরে একটু একটু করে প্রিয় নবীজিকে [ﷺ] জানতে শুরু করেছি। জন্মের আগে বাবা হারানো, খুব শৈশবে প্রিয়তমা মায়ের বিদায়, তারপর দাদা-কে হারানো, একে একে চাচা-ও! আব্বু যখন এসব গল্প আমাদের শোনাতেন, তখন ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গন্ডদেশ বেয়ে গড়িয়ে যেতো আপনাতেই। প্রিয় নবীজির [ﷺ] প্রতি অন্য রকম ভালোবাসার অঙ্কুরোদগম হচ্ছিলো হৃদয়ে। টেপরেকর্ডারে আমাদের খুব গান শোনার বাতিক ছিলো। আমি আর রুবাইয়া কতবার টাকা জমিয়ে সেই ফিতাওয়ালা ক্যাসেটগুলো কিনেছি! ক্যাসেটের দুই দিকে কলম ঢুকিয়ে ফিতা ঘোরানোর স্মৃতিগুলো সহসা ভুলে যাবার মত নয়! তখন আশেপাশে সব পিচ্চিদের কাছে প্রিয় ছিলো শিশুশিল্পী হাসনা হেনা আফরিনের গান। সাইফুল্লাহ মানছুরকেও শোনা হতো প্রচুর। এরই মধ্যে ছোটাচ্চু নিয়ে এলেন নতুন এক অ্যালবাম। খুব

আগ্রহ ভরে শুনলাম সবাই মিলে। ছোটদের কণ্ঠে গাওয়া একটা গান[১] কিভাবে যেন বুকের অনেক গভীরে বিঁধে গেলো:

জন্ম যদি হতো মোদের রাসূল পাকের কালে

আহা, রাসূল পাকের দেশে!
মোদের তিনি কাছে টেনে চুমু দিতেন গালে
আহা, কতই ভালোবেসে!

গুণগুণ করে সারাদিন শুধু এই গান গেয়েছি গভীর অনুরাগে। নামটা ঠিক স্মরণ নেই, তখন কী যেন একটা মাসিক পত্রিকায় সিরিজ লেখা চলছিলো: 'মহানবীর [ﷺ] বাড়িতে একদিন'। আব্বু আমাকে সাথে নিয়ে পড়তেন সেই লেখাগুলো।

রাসূলুল্লাহর [ﷺ] সুন্নাহর সাথে একটা নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করে দিতে আব্বুর ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে জীবনে। পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে আগে সালাম দেয়া, মুচকি হাসা, হাঁচির জবাব দেওয়া— এরকম অনেক চমৎকার অভ্যাসগুলোতে অভ্যস্ত হয়েছি তাঁর হাত ধরে। খাবারের ক্ষেত্রেও তা-ই। পানি পাত্রে দেখে নিয়ে তিনবারে বসে খাওয়া, পেটভর্তি করে খাবার না খাওয়া— শৈশব থেকে এসব সুন্নাহ'র সাথে পথচলা শুরু হয়েছিলো, আলহামদুলিল্লাহ। একদিন প্রিয় নবীজির পোষাকের প্রসঙ্গ এলো। আমি তখন কিন্ডারগার্টেন স্কুলে পড়ি, প্রচলিত পোষাক পরিধানেই অভ্যস্ত। নবীজির [ﷺ] পোষাকের কথা জানার পর খুব শখ করে আব্বুকে আবদার করলাম লম্বা জামা বানিয়ে দিতে।

সব ঠিক আছে, বিপত্তি অন্য জায়গায়। আমার যে দাড়ি নেই! কী হবে এখন? রুবাইয়ার সাথে গোপনে পরামর্শ করে স্থির করলাম, কলম দিয়ে মুখে দাড়ি আঁকা হবে! ব্যস, যেমন ভাবা তেমন কাজ; আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভালোভাবে দাঁড়ি আঁকা হলো। স্কুলে তো সবাই হেসে কুটি কুটি! আমার এমন পাগলামোতে দুজন মানুষ হাসতে হাসতেই উৎসাহ যুগিয়ে যেতেন- শামসুল ইসলাম স্যার এবং তাজুল ইসলাম স্যার। বাড়িতেও একই অবস্থা, কারো হাসি থামে না। ব্যতিক্রম আম্মু আর দাদা। আব্বু প্রাণ খুলে হাসেন। ভালোবাসার পরিমাণটা মধ্যে একবার এতোই বেড়েছিলো, যখন শুনলাম প্রিয়নবীজি [ﷺ] জুতো সেলাই করেছেন, আমিও একবার সেলাই করেছি নিজ হাতে! আব্বু অবশ্য পরে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আমাদের

---

১ গানটির গীতিকার ও সুরকার আবুল আলা মাসুম

জন্যে কোন্ কোন্ সুন্নাহ অবশ্যপালনীয়, কোনটা পালন করা ঐচ্ছিক এবং কোনটা পালন করতে প্রিয়নবী [ﷺ] নিজেই নিষেধ করেছেন।

এসবের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে জীবনের 'রোল মডেল' হিসেবে রাসূলুল্লাহকে গ্রহণ করার সর্বোচ্চ প্রচেস্টা চালাতে আমি প্রশিক্ষণ পেয়েছি শৈশবে, লিল্লাহিল হামদ। সেই যে আমার ভালোবাসা, ভালো লাগা আর আবেগ-অনুরাগের পাত্র বানিয়েছি চর্মচোখে না দেখা এই প্রিয় মানুষটিকে, একটু বড় হয়ে যেখানে যা পেয়েছি সীরাত বিষয়ে, বুকে জড়িয়ে নিয়েছি পরম মমতায়।

আমার সীরাত পাঠের একটা দিক হোল, রাসূলুল্লাহর [ﷺ] জীবনের কোনো অংশের সাথে কোনোভাবে জড়িত সৌভাগ্যবান মানুষগুলোর প্রতি ক্রমশ দুর্বলতা অনুভব করি এবং ভালোবাসা মিশ্রিত একটা অস্ফূট ঈর্ষা জেগে ওঠে। আর আমার গুনগুন করে গাওয়া গানটা বারবার তাড়া কওে ফেরে মন-মুকুরে: 'জন্ম যদি হতো মোদের...'।

ক্লাসে সীরাত আলোচনার সময় খাদীজাহ'র [রা.] প্রসঙ্গটা এভাবে হৃদয়তন্ত্রীতে এসে বাজছিলো। প্রথম ওয়াহি অবতরণের ঘটনায় প্রিয় নবীজি কতটা অপ্রস্তুত এবং শঙ্কিত হয়েছিলেন, আমরা তো জানি-ই। চিন্তা করুন, খাদীজা কত সুন্দর ভাবে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন! ভরসা এবং অভয় দিয়েছিলেন! আপনি ভাবতে পারবেন না, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এমনকি সে সময় প্রাণনাশেরও আশঙ্কা করেছিলেন [বুখারী]। কিন্তু কী যাদু ছিলো এই রমণীর কথায়, কেমন নিশ্চেতন করা অনুভবের সহযোগ ছিলো তাঁর ভরসায়, যে কথা ও ভরসার পাখায় ভর করে আল্লাহপ্রদত্ত দায়িত্ব নিশ্চিন্ত মনে কাঁধে তুলে নেওয়ার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন রাসূলুল্লাহ [ﷺ]?

শুধু তা-ই নয়, নিজের সঞ্চিত সমস্ত বৈভব নবুওয়তি মিশনের জন্যে চোখ বন্ধ করেই বিলিয়ে দিলেন! কতটুকু প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী হলে মানুষ এমনটি পারে, বলুন? সবচে' বড়ো কথা, ঘোর তমসার বুক চিরে যেই মশালটি উন্মেষের অপেক্ষায় ছিলো, দমকা হাওয়ায় সেই মশালটিকে প্রথম শক্ত হাতে ধরেছিলেন এই সাহসী রমণী-ই! তাঁকে না করে আর কাকে ঈর্ষা করবো আমি?

আমার ঈর্ষার তালিকায় দু নম্বরে ছিলেন আবূ বাকর আস-সিদ্দীক [রা.]। কতটুকু দুর্বিনীত প্রত্যয়ের অধিকারী হলে বিনীত বিশ্বাসে এভাবে কেউ মস্তক অবনত করতে পারে, ভেবে দেখেছেন? হিজরতের সেই সময়টার কথা ভাবুন! সাওর গুহার অনিশ্চিত রাত্রিগুলো! ভাবা যায়? প্রিয়নবীর [ﷺ] ভালোবাসায় বিষাক্ত নাগিনীর

দংশন নীরবেই সয়ে যাওয়া! আহ! শুধু কি আমিই ঈর্ষা করি? 'উমার [রা.]-ও কিন্তু তাঁকে ঈর্ষা করতেন। ঐ যে, এক তাঁবুতে স্বজনহারা বৃদ্ধার সেবা করতে দুজনের প্রতিযোগিতা! জানেন-ই তো!

সাওর গুহার বিপদসংকুল সময়গুলোতে আরেকটি গল্প আমরা জানি। চারিদিকে শত্রুর আনাগোনা। শত্রু আবার কী? রক্ত-পিপাসার নেশায় উন্মত্ত হিংস্র হায়েনা যেন! শিকার পেলে যে কি না এক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়বে জান্তব উল্লাসে। তার ওপর আবার গোপন নজরদারি। চিন্তা করুন, সেই কঠিন থেকে কঠিনতর সময়গুলোতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নবীজি [ﷺ] এবং আবূ বাকর কে খাবার পৌঁছিয়ে দিতেন একজন নারী! বাইরের পরিস্থিতিও তাঁদেরকে কৌশলে জানিয়ে দিতেন তিনি। শুধু কি তা-ই? রাসুলুল্লাহ এবং আবূ বাকরের অবস্থান সম্পর্কে তাঁকে আবূ জাহলের মতো বীভৎস ভয়ঙ্কর নরপশু জিজ্ঞাসাবাদ করলেও তিনি মুখের উপর সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি জানি না!' নির্দয় আবূ জাহলের হাতে তিনি প্রহৃতা হলেন, তবু মুখ খোলেন নি। কে তিনি?

ঠিক ধরেছেন, তিনি আসমা বিনতু আবি বাকর [রা.]! ইনি আমার ঈর্ষার তালিকায় তৃতীয়।

মদিনায় আগমনের পর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা হেলেদুলে প্রিয়নবীজিকে [ﷺ] স্বাগত জানাচ্ছিলো। গলা ছেড়ে গাইতে থাকে: ত'লা'আল বাদরু 'আলাইনা... । আহ, আমি যদি থাকতাম মদিনার সেই কিশোরদের দলে!

তারপর... তারপর... সবার মনেই সুপ্ত বাসনা, নবীজি [ﷺ] যদি আমার বাড়িতে আতিথেয়তা গ্রহণ করতেন! নিজেকে ধন্য করার জন্যে সবাই উৎসুক। সেই প্রতীক্ষারও কত পবিত্র অনুভূতি! অবশেষে কী হোল? সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হলেন সাহাবী আবূ আইয়ুব আল-আনসারী [রা.]। কত না ভাগ্যবান তিনি! না, শুধু তিনি নন, তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীও রাসূলকে নিজেদের ঘরে অতিথি হিসেবে পেয়ে যারপরনাই উদ্বেল হয়েছিলেন। প্রিয়নবীজির [ﷺ] ইচ্ছে অনুযায়ী তাঁকে নিচতলায় শোয়ার ব্যবস্থা করে তাঁরা দুজন দোতলায় শুয়েছিলেন। মজার বিষয় হোল, তাঁরা কিন্তু একরত্তি ঘুমোতে পারেন নি রাত্রে। কেন? দুজনেই খুব অস্বস্তিতে ছিলেন, ভাবছিলেন, প্রিয়নবীকে নিচ তলায় রেখে তাঁদের এখানে অবস্থান করাটা তাঁর শানে কোন গোস্তাকি হচ্ছে না তো! আরেকবার ভাবলেন, দুজনের অবস্থানটা ঠিক বরাবর রাসূলের মাথার উপরেই হচ্ছে না তো! এ জন্যে বারবার বিছানাটা এদিক ওদিক করেছেন। এরই মধ্যে ঘটে গেল আরেক ব্যাপার, এই অস্বস্তিকর সময়ে

অস্থিরতায় তাদের পানির কলসটা হঠাৎ হেলে পড়লো। আর যায় কই, সব পানি গড়িয়ে যেতে লাগলো। দুজন তো ভয়ে, শঙ্কায় আরো অস্থির হয়ে উঠলেন! কী আর করবেন, নিজেদের কম্বলটাই পানির উপর দিয়ে দিলেন, যাতে কম্বল পানি চুষে নেয় এবং গড়িয়ে নিচ তলায় না যায়; ওখানে যে প্রিয়নবী শুয়ে আছেন! আহারে, পুরো রাত তাঁরা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপলেন। সকালে এই ব্যাপার রাসূলুল্লাহ [ﷺ] শুনতে পেলেন এবং সেদিন থেকে তিনি তাদের নিচতলায় পাঠিয়ে দিয়ে নিজে দোতলায় অবস্থান গ্রহণ করলেন।

গল্প তো শুনে ফেলেছেন! ব্যাপার হোল, আমার ঈর্ষার তালিকায় চতুর্থ এবং পঞ্চম হলেন ইনারা দুজন!

সেই হিজরতের সময়কারই আরেকটি চমৎকার গল্প বলি।

প্রিয়নবীকে পেয়ে সবার মনেই খুশির জোয়ার। কে কী গিফট করবেন রাসূলকে, কূল-কিনারা পাচ্ছেন না। আবেগঘন আনন্দের সময় যা হয় আর কি! কেউ তাঁকে কবিতা নিবেদন করছেন, কেউ তাঁর নিজ বাগান থেকে খেজুরের থোকা নিয়ে আসছেন... এই এই আরো কত কী!

কিন্তু একজনের নিবেদন ছিল একেবারেই ব্যতিক্রম! তাঁর সাধ্যে এমন কিছু ছিলো না, যা তিনি প্রিয়তম রাসূলকে নিবেদন করবেন। অবশেষে নিজের কিশোর পুত্রকেই প্রিয়নবীর [ﷺ] কাছে পেশ করলেন। পুত্রও যারপরনাই খুশি হয়ে রাসূলের [ﷺ] ছায়ায় নিজেকে ধন্য মনে করলেন! বলুন, এর চে' বড়ো আন্তরিক নিবেদন আর কী হতে পারে?

কে তিনি? তিনি ধন্য রমণী গুমাইছা বিনত মিলহান [রা.]। আর কে সেই ভাগ্যবান কিশোর? তিনি আনাস ইবন মালিক [রা.]।

অতঃপর তালিকার ষষ্ঠ ও সপ্তম অবস্থানে থাকা দুজন ভাগ্যবতী ও ভাগ্যবানের সাথে আপনারা পরিচিত হলেন।

এবারের গল্প শুনে তো আপনি নিজেই ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরে যেতে চাইবেন!

চোখ বন্ধ করে কল্পনা করুন তো, রক্তে-মাংসে গড়া একজন মানুষের কাছে স্বয়ং জিবরীল [আ.] এসে সালাম পৌঁছাবেন; তিনি কী দুর্দান্ত সৌভাগ্যের অধিকারী!

পৃথিবীতে তো বটেই, জান্নাতেও রাসূলুল্লাহর [ﷺ] সাহচর্যের সুসংবাদ পেয়েছেন আল্লাহর কাছ থেকেই!

আপনি ভাবছেন, ইনি মানুষ না অন্য কিছু!?

হুমম! তিনি হলেন 'আয়িশা বিনত আবি বাকর [রা.]। আক্ষরিক অর্থেই একজন Polymath ছিলেন তিনি। কবিতা ও কাব্যতত্ত্বে অগাধ পান্ডিত্য তাঁর। চিকিৎসাবিদ্যায় ছিলেন পারদর্শী। ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণের ব্যাপারে কানাকড়ি পরিমাণ ছাড় দিতেন না তিনি। হাদিসশাস্ত্রেও তাঁর অবদান অনবদ্য। সাহাবী আবূ মূসা আল-আশ'আরীর [রা.] স্বীকৃতি শুনুন, 'আমাদের কোনো হাদিসের ব্যাপারে যদি কোনো সন্দেহ হত, তখন 'আয়িশাকে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হতে পারতাম।'

মাদরাসার ছাত্ররা জানেন 'ইলমুল ফারায়িদ্ব (ইসলামী উত্তরাধিকার বণ্টন নীতি) কত জটিল এবং সূক্ষ্ম বিষয়। বিষয়টা যদি কারো কাছে কঠিন মনে হয়, চিন্তিত হবেন না, সাহাবীরাও [রা.] কিন্তু মাঝে মাঝে সমস্যায় পড়ে যেতেন এই বিষয়টিতে। তখন তাঁরা কী করতেন জানেন? 'আয়িশার [রা.] কাছে চলে আসতেন সমাধানের জন্যে!

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তো আছেন-ই তিনি (মোট ২২১০টি)।

জীবনের অন্তিম সময়ে প্রিয়নবীকে [ﷺ] আগলে রেখেছিলেন তিনি। তাঁর সান্নিধ্যেই প্রিয়নবী আল্লাহর কাছে চলে গিয়েছেন। তাঁর কক্ষেই প্রিয়নবী-কে [ﷺ] সমাহিত করা হয়েছে। কত না সৌভাগ্যবতী তিনি! তিনি আমার অষ্টম ঈর্ষা।

আচ্ছা বলুন তো, প্রিয়নবীকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে তাঁর চে' বেশি কে পারঙ্গাম? রাসূলের এমনই কাছের মানুষটিই তো ভালো বলতে পারবেন, কেমন ছিলেন তিনি! আবার প্রিয়নবীর চরিত্র, স্বভাব ইত্যাদির সাথে কার বেশি মিল আছে, সেটাও অন্যদের চে' নিশ্চয় তিনি ভালো বলতে পারবেন! তাই না?

তবে শুনুন তাঁর কথা: 'আমি কথাবার্তা, আচার-আচরণে রাসূলের [ﷺ] সাথে সাদৃশ্যময় ফাতিমার চে' আর কাউকে দেখি নি। এমনকি তাঁর হাঁটা-চলাও ছিলো রাসূলের হাঁটা চলার মত। [বুখারী]

কখনো কোনো পুরুষ সাহাবীর ব্যাপারে এমনটি শুনেছেন আপনারা কেউ? ভগিনীগণ গর্ব করতে পারেন এটা নিয়ে! আর হ্যাঁ, চুপিসারে বলে রাখি, নবীজির [ﷺ] ভাষ্যমতে জান্নাতে আপনাদের মধ্যমণি হবেন কিন্তু ফাতিমা [রা.]!

প্রিয়নবী এতোটাই ভালোবাসতেন তাঁকে, কখনো কোনো সফর থেকে ফিরলে প্রথমেই মসজিদে ঢুকে দু রাকাত সালাত আদায় করতেন, এরপর ফাতিমার গৃহে গিয়ে তাঁর খোঁজ-খবর নিতেন, তারপর উম্মাহাতুল মুমিনীনদের খোঁজ নিতেন।

ঈর্ষা রে ঈর্ষা! কী আর করা, তালিকার নয় নম্বরে তাঁকে নিয়ে নিলাম।

আমরা শেষ পর্যায়ে এসে পড়লাম। দশম ঈর্ষার কথা বলবো। এবার একটু পেছন ফিরে তাকাই। আপনাদের মনে আছে, মাক্কী জীবনের সেই আগুনঝরা দিনগুলোর কথা? সেই রক্তপিচ্ছিল পথের যাত্রীদের তেজোদ্দীপ্ত ঈমান! কল্পনা করতে পারেন? একজন স্বাধীন মানুষ যেখানে ঈমানের ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথেই পাশবিক নির্যাতন আর লাঞ্ছনার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতেন, সেখানে একজন ক্রীতদাসী কতটুকু ঈমানের জোর হলে কালিমার দৃপ্ত উচ্চারণের সাহস করতে পারেন? ভেবেছেন কখনো?

বলছিলাম আম্মার [রা.]-এর স্নেহময়ী জননী সুমাইয়ার [রা.] কথা। চিন্তা করুন, অমানুষিক নির্যাতনের মুখে এই মহিলা যদি একটিবার শুধু বলতেন, 'আমি দ্বীন ত্যাগ করলাম', তাহলেই নিষ্কৃতি পেতেন। কিন্তু এই একটি বাক্য উচ্চারণ করা তাঁর কাছে পাশবিক নিষ্পেষণ সহ্য করার চেয়েও বেশি ভয়ানক কঠিন মনে হয়েছিল! নরপিশাচ আবু জাহল নির্মম ভাবে বল্লমের আঘাতে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমাদের বোনটিকে শহীদ করেছিলো! গ্রহণযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ সমূহের অন্যতম 'তাবাকাত ইবন সাদ'-এর ভাষ্যমতে, দ্বীনের জন্যে এটিই ছিল ইতিহাসের প্রথম আত্মত্যাগ।

লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই, আপনাদের জানাশোনা অনেক সাহাবীর কথা-ই এখানে আসে নি, তাই না? আমার অধ্যয়নবিচ্ছিন্নতার কারণে একেক জায়গায় একেকজনের কথা লিপিবদ্ধ করেছি। কখনো কখনো এমন হয়েছে, কোনো কোনো সাহাবীর জীবনকাহিনী খুব ছুঁয়ে গেছে আমাকে, কিন্তু ঐ সময়টাতে লেখার সুযোগ করে নিতে পারি নি। তবে এই দশজনের কথা একটি ডায়েরিতেই লিখেছিলাম। আমার ঈর্ষাপ্রবণতার যখন সূচনালগ্ন, তখন এঁদের সাথে আমার পরিচয়। তাই সেই ডায়েরির দশটা নাম আমার কাছে অত্যুজ্জ্বল অনুক্ষণ। এই যে তাঁদের দশজনকে নিয়ে এতক্ষণ গল্প করলাম, তার কারণ হচ্ছে, আজকে হঠাৎ করে ডায়েরিটা উল্টাতে উল্টাতে আবিষ্কার করলাম, এখানে পুরুষ সাহাবী ও নারী সাহাবীর অনুপাত হচ্ছে ৩:৭। কী আশ্চর্য, আমার ঈর্ষার প্রথম তালিকায় প্রথম দশজনের সাতজন-ই নারী সাহাবী! খুব উৎফুল্লচিত্তে ছোটবোনকে দেখালাম। অনেকক্ষণ ধরে গল্প করলাম আমাদের মুগ্ধতা ও অনুপ্রেরণার এই মানুষগুলোকে নিয়ে। সদ্য-আবিষ্কৃত অনুপাতটা ওকে দেখিয়ে

সহসা-ই আমার মুখ থেকে উচ্চারিত হল আপনাতেই: 'জাগো গো ভগিনী!' সেই শব্দবন্ধ দিয়েই এই প্রবন্ধগল্পের শিরোনাম বাছাই করলাম। এই বইয়ের নারী পাঠকদের প্রতি অনুরোধ থাকবে, সম্ভব হলে লেখাটা আরেকবার পড়বেন, জেগে ওঠার বিশুদ্ধ প্রাণনায় প্রাণিত হবেন।

আমি নিষ্পাপ হতে চাই

ইশশ!
সেই নিষ্পাপ শৈশবে যদি একটু ফিরে যেতে পারতাম!
দুধেল সাদা শৈশব!
শুভ্র-সফেদ শৈশব!
পঙ্কিলতাহীন শৈশব!
পবিত্রতার আবেশ জড়ানো শৈশব!

কে না চায়, নিজের সব ভুল-ভ্রান্তিকে পেছনে ফেলে অনাবিল স্নিগ্ধতায় ভরপুর সেই শৈশবে ফিরে যেতে?

এই যে আমরা, তারুণ্যের উচ্ছ্বলতায় ভরপুর জীবন যাদের, পথ চলতে চলতে হঠাৎ করেই ইচ্ছে হয়, সব মায়া-মরীচিকার জটিল অঙ্ক বাদ দিয়ে আলোয় আলোয় ভরা সরল-ঋজু দিনগুলো আরেকবার আপন করে পেতে!

বিশ্বাসী হৃদয় এই বাসনায় উদগ্রীব থাকে একটু বেশি-ই। এই বাসনার সাথে জড়িয়ে আছে মহাসমুদ্ররূপী মহাকালের ঠিক মাঝখানে হাবুডুবু খাওয়ার গ্লানি থেকে পরিত্রাণ পাবার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা।

তারুণ্য বা বার্ধক্যকে পেছনে ফেলে শৈশব ফিরে পাওয়া আদৌ সম্ভব নয়, তবুও এই কল্পনার জগতে পরিভ্রমণের সময় নিজেকে বিশুদ্ধতার সফেদ উত্তরীয়তে জড়াবার যে স্বপ্ন লুকিয়ে থাকে অন্তরে, সেই স্বপ্নের মুখে একটু আলোর ঝলক দেয়ার জন্যে আমাদের এবারের আসর। আসর শুরু করার আগে আমরা এই ধরনের ভাবনা-পরিবাহী একটি কবিতার সাথে পরিচিত হয়ে যাই।

ইংরেজি সাহিত্যে মেটাফিজিক্যাল ধারার কবিদের একজন হেনরি ভন (Henry

Vaughan); তাঁর বিখ্যাত *The Retreat*[১] কবিতাটি আমরা এখানে কাব্যানুবাদের চেষ্টা করেছি, প্রবহমান মাত্রাবৃত্ত ছন্দে।

কত না স্নিগ্ধ ছিলো পেছনের ফেলে আসা দিন সব!
ফেরেশতাদের মতো আলোকিত ছিলো সেই শৈশব!
হয় নি যখন এই পৃথিবীকে গভীর দেখা,
এবং ধরার জীবনে নিজের নামটি লেখা;
সস্তা এসব তত্ত্বীয় প্যাঁচ আমার যখন হয় নি শেখা-
তখন আমার শুভ্র ভাবনা জুড়ে ছিল এক অপার্থিব সৌরভ!

আমার প্রভুর ভালোবাসা থেকে আসি নি তখনো অনেক দূরে,
ওখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পেতাম তাঁর আলোটাকে দৃষ্টি জুড়ে,
ঘণ্টাখানেক সময় ধরেই আমার আত্মা এক নিমেষে-
মিশে যেতো সেই স্বর্ণালী মেঘ কিংবা পুষ্পরাজির দেশে!
কিছু অনন্ত ছায়া-ই মূলত আসত এসব খুব সাধারণ জ্যোতির বেশে!

তখন আমার ভাষায় ছিলো না রুক্ষ-কঠিন ছাপ,
আমার হৃদয়ে সরব হয় নি তখনও কোনো পাপ!

এমন কলুষ স্বভাব ছিলো না, ইন্দ্রিয়কে যা দিয়ে
প্ররোচিত করা যায় অনুক্ষণ পাপের কাছেই নিয়ে।
বরং আমার দেহ-মনে শুধু অনুভব হতো সেই-
অনন্ত থেকে আসা উজ্জ্বল জ্যোতির দীপ্তিকেই!

জানি না এখন কিভাবে যে আমি এতদূর যাবো ফিরে!
সেই সে পুরনো পথে-প্রান্তরে হাঁটতে আবার ধীরে!
যেখানে ছিলাম ভাস্বর আমি প্রাণে আর প্রাণনায়,
প্রথম সোনালি শৈশব রেখে এসেছি যেখানে হায়,
দেখতো শহর আলোর মনন তাল-তমালের ছায়!

কিন্তু আমার আত্মা এখানে কাটিয়েছে আহা অনেক কাল!
হয়ে গেছে তাই উন্মাদ-সম, চলতে গেলেই টালমাটাল!
মানুষেরা নাকি সামনে যেতেই স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পায়
কিন্তু আমার হৃদয়টা আজ কেবল পেছনে ফিরে যেতে শুধু চায়!

আরেকবার পড়ুন তো! আমাদের অব্যক্ত অনুভূতিগুলো কী অপূর্ব ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত করেছেন কবি! তাই না?

---

১ Poems of Henry Vaughan, Vol. 1, P. 59-60.

চলুন, এবার আমরা আমাদের সেই স্বপ্নিল পথে হাঁটা শুরু করবো। খুব কঠিন কিছু ভাবছেন? আরে নাআআ, একদম সহজ, দেখুন না!

আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন, হ্যাঁ!

এই পথে হাঁটতে গিয়ে পথিকদের কাছ থেকে আমরা কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হবো

» **আমি কিভাবে পাপ-পঙ্কিলতামুক্ত হবো? নিষ্পাপ হওয়া কি সম্ভব?**

» **আমার এত্ত এত্ত পাপ! আল্লাহ ক্ষমা করবেন তো!?**

» **আমি বারবার ফিরে আসি, কিন্তু নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারি না। পাপে জড়িয়ে যাই!**

এই তিনটি মৌলিক প্রশ্ন / সংশয় / জড়তা– যাই বলুন– এগুলো আমাদের স্বপ্নিল পথে হাঁটার সামনে কাঁটা হয়ে থাকে। আমরা এই কাঁটাগুলো একটি একটি করে তুলে ফেলতে চাই। চলুন তাহলে... বুকে হিম্মত রেখে সন্তর্পণে শুরু হোক যাত্রা!

আমি কিভাবে পাপ-পঙ্কিলতামুক্ত হবো? নিষ্পাপ হওয়া কি সম্ভব?

আমরা অত থিওলজিক্যাল কথাবার্তায় যেয়ে কী করবো? চলুন, গল্প করতে করতে এগিয়ে যাই!

ক

ছোটভাই নাফিস অনেকক্ষণ ধরে পেন্সিল দিয়ে কি জানি আঁকছিলো খাতায়। আঁকা শেষ হবার পর বোধহয় ওর মনঃপুত হয় নি, অঙ্কিত দৃশ্যের প্রতি একরাশ বিরক্তি ঝরিয়ে সে রাবার দিয়ে মুছে ফেললো, পুরো পৃষ্ঠাটাই পুনরায় সাদা হয়ে গেলো। চাচ্চু আর আমি গপ্পো করছিলাম, দুইজনেই কথা থামিয়ে ওর কান্ডকারখানা দেখছিলাম। চাচ্চু যথারীতি ভাবুক হয়ে ওঠলেন,

আচ্ছা, নজীব! আমাদের জীবনটাও এমন হলে কেমন হতো! জীবনের ভুলগুলো যদি এক নিমেষেই মুছে ফেলা যেতো! কিংবা জীবনের কোনো একটা অধ্যায়কে যদি ঠিক এভাবেই দৃশ্যপট থেকে আড়াল করে দিয়ে ধবধবে সাদা করে দেয়া যেতো! আহ! সেরকম একটা রাবার থাকলেই হতো!

খ

কম্পোজে আমার হাত মোটামুটি দ্রুত চলে। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই এম এস ওয়ার্ডে একটা প্রবন্ধের ফরম্যাট খসড়া করছিলাম। কিন্তু প্রতিবারই পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার পরও মনে ধরছিলো না। রুমমেট খুব মনোযোগ দিয়ে আমার টাইপিং দেখছিলো। সবার জানার কথা, লেখার সময় Ctrl+Z প্রেস করলে বর্তমান অবস্থা থেকে পুরনো অবস্থায় ফিরে যাওয়া যায়, যেটাকে কম্পিউটারের পরিভাষায় আমরা 'undo' বলে থাকি। রুমমেট একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলছিলো,

জীবনে যদি একবার একটা Ctrl+Z অপশন পাইতাম, নতুন করে জীবনটারে সাজাইতাম! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য একটা Ctrl+Z অপশন থাকতো যদি…!

গ

আমরা যাঁরা নিষ্পাপ হতে চাই, আমরা তো ঠিক এমনটাই কল্পনা করি, নাকি?

আপনিও কি সেরকম একটা রাবার খুঁজছেন?

অথবা একটা Ctrl+Z অপশন খুঁজে বেড়াচ্ছেন?

চিন্তার কারণ নেই, আমিই খুঁজে দিচ্ছি আপনাকে। সেই রাবার অথবা Ctrl+Z অপশন-এর আল্লাহ প্রদত্ত নাম হচ্ছে: 'আত-তাওবাহ'!

: কী বলছেন!? রাবার কিংবা Ctrl+Z অপশন এর মতো তাওবাহ কি আমাকে একেবারে সাফ-সুতরো করে দিতে পারবে? আমার এত্ত এত্ত পাপ আর ভুল-ভ্রান্তিকে কিভাবে মুছে দেবে?

: বুঝছি, আপনি তাহলে আশ্বস্ত হতে পারছেন না! এই নিন, আপনার জন্যে এক্কেবারে প্রিয়নবীজি [ﷺ] থেকেই আশ্বাসবাণী নিয়ে এলাম:

"

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

"পাপ থেকে তাওবাহকারী ব্যক্তি সেই ব্যক্তির মতোই, যার কোন পাপ-ই নেই।[১]"

---

১ সুনান ইবন মাজাহ: ৪২৫০; সুনান আল-কুবরা (বায়হাক্বী): ২১০৭০

ঘ

: চাচ্চু, রাবার পেয়ে গেছেন? ঝটপট মুছে ফেলেন তাইলে!

: ভাইয়া, Ctrl+Z অপশন পেয়েছো!? তাইলে তাড়াতাড়ি প্রেস করো!

চাচ্চু রাবার নিয়ে মেতে ওঠলেন।
ভাইয়াটা সেই শবু প্রেস করে ফেললো।

আপনি পেরেছেন তো?
না পারলে জলদি সেরে ফেলুন!

একটা কাঁটা সরে গেলো, আলহামদুলিল্লাহ। এবার আরেকটি কাঁটার সাথে বোঝাপড়া করবো আমরা। সেই কাঁটাটি হচ্ছে, তাওবাহ করার ক্ষেত্রে একটা সংশয় আপনাকে এসে বারবার খোঁচাতে থাকবে,

আমার এত্ত এত্ত পাপ! আল্লাহ ক্ষমা করবেন তো!

এই সংশয় অমূলক কিছু নয়। তবে একইসাথে, এই সংশয় কিন্তু একেবারেই বালির বাঁধ! কেনো জানেন? উত্তরটা আল্লাহর কাছ থেকেই শুনে নেই:

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"আপনি বলে দিন যে, (আল্লাহ বলেন) আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর যুলম করেছো, তোমরা আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ (অতীতের) সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করবেন; নিশ্চয়ই তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, দয়ালু।[১]"

গভীর অনুভূতি দিয়ে একটু অনুভব করতে চেষ্টা করুন। এটা আমার নিজস্ব কোনো সান্ত্বনা নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক নিশ্চিত সত্য প্রতিশ্রুতি!

আপনার হতাশ হবার সুযোগ থাকে আর?

এবার একটা গল্প শোনাই।
বানানো গল্প নয়, আমরা নবীজির [ﷺ]-এর কাছ থেকেই গল্পটা শুনবো:

---

১ সূরা আয-যুমার ৩৯:৫৩

“

كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لاَ . فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلاَ تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ. فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ. وَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ. فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ. فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ

“তোমাদের পূর্বেকার জাতির একটি লোক নিরানব্বই জনকে হত্যা করে, এরপর সে সবচেয়ে বড় একজন জ্ঞানী লোকের (‘আলিমের) খোঁজ করে, তখন তাকে একজন ইবাদতগুজার ব্যক্তির কথা বলা হয়। সে তাকে গিয়ে বলে, আমি নিরানব্বই জন মানুষকে খুন করেছি, আমার তাওবাহ হবে? তিনি বললেন: না। অতঃপর তাকে হত্যা করে সে একশো জন লোক পূর্ণ করলো। অতঃপর সে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির খোঁজ করলে আরেকজন ‘আলিমের খোঁজ দেয়া হয়। সে তাঁকে গিয়ে বলে, আমি একশোজন লোক হত্যা করেছি, আমার কি তাওবা করার সুযোগ আছে? তিনি বললেন: ‘হ্যাঁ, আছে। কে তোমার ও তাওবার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে?’ তুমি অমুক স্থানে যাও, সেখানে কিছু মানুষ রয়েছে যারা আল্লাহর ইবাদত করে, তুমি তাদের সাথে গিয়ে আল্লাহর ইবাদত কর। আর তুমি তোমার এলাকায় ফিরে যেও না। কেননা তোমার এলাকাটা খুব খারাপ। সে তখন যাত্রা শুরু করে। অর্ধেক পথ অতিক্রম করার সময় তার মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়। অতঃপর তার ব্যাপারে রহমত ও আযাবের ফেরেশতারা বিবাদে লিপ্ত হন। রহমতের ফেরেশতারা বলেন: সে তাওবা করে আল্লাহর পানে ছুটে এসেছে। পক্ষান্তরে আযাবের ফেরেশতারা বলেন: সে কখনো কোনো ভালো কাজই করে নি। অতঃপর সেখানে মানুষের বেশে একজন ফেরেশতা আসেন। তারা তাকে বিচারক মানেন। তিনি বলেন: তোমরা দুদিকটা মেপে দেখ। সে যেদিকে অধিক নিকটবর্তী হবে, তাকে সেদিকের বলে ধরে নেয়া হবে। অতঃপর মেপে দেখা গেল যে, সে যেদিকে যাচ্ছিল সে দিকটাই নিকটে। এর ফলে তাকে রহমতের ফেরেশতারা নিয়ে যায়।[১]”

এবার আমাকে বলুন, আপনার যাপিত জীবনে সঞ্চিত পাপগুলো কি এই লোকটার

---

১ সাহীহ মুসলিম: ২৭৬৬

চেয়েও বেশি ভয়ানক? পরিমাণে অধিক?

একশোটা লোক হত্যা করার মত বিশাল পাপের বোঝা আপনার কাঁধে বর্তমান?

এতো বড়ো ও অকল্পনীয় পাপের বোঝা নিয়েও কেউ যদি আল্লাহর অপরিসীম করুণার ছায়ায় জায়গা করে নিতে পারে, আমি বা আপনি কেন পারবো না?

হাদিসের গল্পে দেখলেন তো! আল্লাহ্ কত বেশি করুণার আধার, চিন্তা করা যায়!

বান্দাহকে ক্ষমা করার জন্যে কত বেশি উদগ্রীব, ভাবা যায়!

শুধু কি তা-ই? তাওবাহ করার পর আল্লাহ্ আপনার সমস্ত পাপকে পুণ্যে 'কনভার্ট' করে দেবেন! এই যে, আল্লাহ বলছেন:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا . إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .

"আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বুদের ইবাদত করে না এবং আল্লাহ যাকে (হত্যা করা) হারাম করে দিয়েছেন, তাকে হত্যা করে না শরীয়ত সম্মত কারণ ব্যতীত, এবং তারা ব্যভিচার করে না। আর যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে, তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। কিয়ামাতের দিন তার শাস্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সে তাতে অনন্তকাল লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকবে। কিন্তু যারা তাওবা করবে এবং ঈমান আনবে আর নেক কাজ করতে থাকবে, আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পুণ্যে পরিবর্তন করে দেবেন। আর আল্লাহ বড়ই করুণাময়।[১]"

এত্ত বড় সুযোগ কি হাতছাড়া করা যায়, আপনিই বলুন?

তাহলে আর দেরি কেন?

সব দ্বিধা-সংশয় ঝেড়ে ফেলে এক্ষুণি দুই হাত সঁপে দিন প্রিয়তম প্রভুর কাছে। অশ্রুর ফোঁটা নিবেদন করুন গভীর অনুরাগে।

দুইটি কাঁটার তো হিল্লে হোল! এবার আপনার মনে আরেকটা সংশয়ের আগমন:

তাওবাহ তো করেছি। প্রায়-ই করি। কিন্তু নিজেকে যে ধরে রাখতে পারি না!

---

১ সূরা আল-ফুরকান ২৫:৬৮-৭০

একদমই চিন্তা করবেন না। আপনি ইতোমধ্যে দুটো স্তর পার হয়ে এসেছেন। এবারের স্তর পার হওয়ার চ্যালেঞ্জ আরো সোজা, ইন শা-আল্লাহ!

কিভাবে?

চলুন একজন ভাইয়ার গল্প বলি। তিনি বলছিলেন,

এইবার শেষ! নিজেকে এবার শক্ত করে শাসালাম, কোনভাবেই আর পাপে জড়ানো যাবে না। তাওবাহ করলাম, কয়দিন ভালো মতোই কাটলো। নাহ, শেষমেষ কিভাবে যে পাপটাতে আবার জড়িয়ে গেলাম! এমনটা প্রায়-ই হচ্ছে, ভাই! আমি মনে-প্রাণে চাই এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে। কিছু একটা বল ভাই!

আপনার এই সমস্যাটা যদি আমি একটু ব্যাখ্যা করে বলি, তাহলে দাঁড়ায়:

আপনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অবাধ্যতাকে খুবই গর্হিত এবং নিন্দনীয় কাজ মনে করেন। আপনার প্রিয়তম স্রষ্টা কর্তৃক নিষিদ্ধ কোনো বিষয়কে আপন করে নিতে আপনার মন সায় দেয় না। তবুও লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে, সময়ে-অসময়ে আপনি তাতে জড়িয়ে পড়ছেন। তার জন্যে আবার প্রচণ্ড অনুশোচনাও হচ্ছে। তাওবাহ করে ফিরে আসার পর আপনার প্রতিজ্ঞা নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে; যার কারণে আবারো পুরনো পথেই হাঁটছেন। তারপর আবারও অনুশোচনায় পুড়ছেন!

মোটামুটি এই অস্বস্তিকর চক্র থেকে এখন আপনি মুক্তি পেতে চান।

ঠিক ধরেছি না?

আপনার কিন্তু হতাশ হবার কিচ্ছু নেই!

আরেহ, আপনি নিজেই জানেন না, স্বয়ং আল্লাহ আপনাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছেন!

বিশ্বাস হয় না?

বুঝেছি, আপনাকে চাক্ষুষ দেখাতে হবে আর কি! দেখুন, আল্লাহ আপনার জন্যে কী বলছেন:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন।[১]"

---

১ সূরা আল-বাক্বারাহ ২:২২২

চাট্টিখানি কথা?

খুব গভীরভাবে খেয়াল করে দেখুন, আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন!

চোখ বন্ধ করে আবার কল্পনায় আনুন, আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন!

হ্যাঁ,

ভালোবাসেন!

স্বয়ং আল্লাহ!

আরশের মালিক!

জ্বী, আপনাকেই!

এই যে পাপে জড়িয়ে যাবার পরই আপনি ফিরে আসছেন, আল্লাহ এ জন্যে আপনাকে ভালবাসেন।

তাওবাহ করার পর যখন আপনার প্রতিজ্ঞা নড়বড়ে হয়ে যায়, চোখ বন্ধ করে নিজেকে একটু স্মরণ করিয়ে দিন,

হে আমার আত্মা!

তুমি চেনো নিজেকে?

তোমাকে যে আল্লাহ ভালোবাসেন!

তুমি এই পবিত্র ভালোবাসার অমর্যদা কিভাবে করবে?

তুমি অভিশপ্ত শাইত্বানকে সন্তুষ্ট করতে আরশের মালিকের ভালোবাসাকে পায়ে ঠেলে দিতে পারো না!

তুমি আমার প্রিয়তম স্রষ্টার ভালোবাসায় অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার কালো ছাপ ফেলতে পারো না!

না, তুমি অত নীচ হও নি, হে প্রিয় আত্মা!

তোমার প্রভুর ভালোবাসাকে জলাঞ্জলি দিয়ে কোন্ মুখে তাঁর সামনে দাঁড়াবে, বলো?

দেখুন তো, এরপর চোখটা ছলছল করে ওঠে কি না! অনুভব করলে দেখবেন, চোখের এই জল আপনার হৃদয়ের কালিমা-মলিন পঙ্কিলতাকে ধুয়ে মুছে শুভ্র করে দিয়েছে কখন, আপনিই টের পান নি!

এবার বলুন, আপনার কি কোনো সুযোগ থাকে আর? পাপে জড়াবার? আল্লাহর অবাধ্যতার? নাফসের গোলামির?

খুব সাধারণ, সাদামাটা ও সহজ সমাধান, যদি আপনি আন্তরিকভাবে প্রয়োগ করতে পারেন।

একইসাথে, আপনি আপনার প্রিয়তম প্রভুর একটি মর্মভেদী আহŹানকে স্মরণ রাখতে পারেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا

"মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবাহ করো, আন্তরিক তাওবাহ![১]"

এই যে আমরা বললাম, 'আন্তরিক তাওবাহ'– এটা ঠিক কী রকম? এই অনুবাদ মূল আরবি শব্দবন্ধ 'তাওবাতান নাসূহা'কে পুরোপুরি বিম্বিত করে নি, এই শব্দবন্ধের যথার্থ আবেদন কী, জানতে হলে আমাদেরকে যেতে হবে তাফসীরকারদের কাছে। দেখে আসি, তাঁরা কী বলেন। 'তাফসীর শাওকানী' আমাদের জানাচ্ছে, 'তাওবাতান নাসূহা' বলা হয় এমন তাওবাহ-কে, যে তাওবাহটি তাওবাহকারীকে প্রণোদনা যোগায় পূর্বেকার পাপের দিকে ফিরে না যেতে।[২]

আয়াতটা আবার পড়ুন। কথাটা কিন্তু আল্লাহর! বলা হচ্ছে আপনাকে লক্ষ করে! আপনার প্রিয়তম প্রভুর কথা আপনি রাখবেন না, এমনটা কী হয়, বলুন? কথাটা রাখতে হলে কী করা চাই? কিচ্ছু করতে হবে না, আজকের তাওবাহটাকেই 'তাওবাতান নাসূহা' করে ফেলতে হবে। ব্যস, আপনার কাজ শেষ!

এবার আপনার খুব পরিচিত একটি দু'আকে পুনর্বার স্মরণ করিয়ে দেই। আপনার মনোবল বৃদ্ধি করা, অটল থাকার স্পৃহা জাগ্রত রাখা এবং মানসিক সুস্থিরতার জন্যে আল্লাহর কাছে চাওয়া চাই অনবরত! প্রিয়নবীজি-ও [ﷺ] তা-ই করতেন। তাঁর প্রিয়

---

১ সূরা আত-তাহরীম ৬৬:৮

২ তাফসীর শাওকানী, খ. ৭ পৃ. ২৫৭

দু'আগুলোর মধ্যে একটি ছিলো এটি, যা আপনিও জানেন, কিন্তু ততবেশি গুরুত্ব দিয়ে কখনো ভাবেন নি। যদি মুখস্থ না থাকে, তবে আমার বিশ্বাস, দুই মিনিটের বেশি আপনার লাগবে না এটাকে 'ঠোঁটস্থ' করে ফেলতে! চলুন দেখি, কী সেই দু'আ!

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا على طاعَتِكَ

"হে আল্লাহ! হে অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারী! আমাদের হৃদয়গুলো তোমার আনুগত্যের ওপর অবিচল রাখো![১]"

আপনি আপনার প্রিয়তম প্রভুকে ভালোবাসেন। তাঁর অবাধ্য না হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। আবার মাঝে মাঝে সুযোগ হলেই তাঁর কাছে আবেগভরা কণ্ঠে আবদার জানান, যেনো আপনার এই প্রচেষ্টায় তিনি সহায় হন, বারাকাহ ঢেলে দেন।

ব্যস, আপনার দিনগুলো আপনার প্রভুর সাথে অকৃত্রিম ভালোবাসা ও ভালো লাগায় কেটে যাবে। এই ভালোবাসায় চিড় ধরাতে পারবে না কেউ। কেউ-ই না!

যখন আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসছেন, আপনিও তাঁর ভালোবাসার মূল্য দিচ্ছেন, তাঁর কাছে চাচ্ছেন, তিনিও অকাতরে ঢেলে দিচ্ছেন- বুঝতেই পারছেন, কী গভীর প্রীতির বন্ধনে আপনাকে জড়িয়ে নিয়েছেন আপনারই প্রভু! এই বন্ধন ছিন্ন করে কে?

চোখ বন্ধ করে দেখুন, দ্বীনের পথে আপনার অবিচল পথযাত্রার এই আনন্দকে আরো কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাগণ চলে এসেছেন ইতোমধ্যে! তাঁরা আপনার জন্যে জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন! এই দেখুন, কুরআন বলছে:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

"নিশ্চয় যাঁরা বলে, আমাদের রব্ব আল্লাহ এবং তার ওপরেই অটল অবিচল থাকে, তাঁদের প্রতি ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হন এই বার্তা নিয়ে: তোমরা ভয় করো না, দুশ্চিন্তা করো না, তোমাদের জন্যে প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ নাও![২]"

এবার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে একটি মুচকি হাসি দিয়ে ফেলুন দেখি! অতঃপর নিজের সাথে কথা বলা শুরু করুন...!

---

১ সাহীহ মুসলিম: ২৬৫৪

২ সূরা ফুসসিলাত ৪১:৩০

তিনটি ধাপ আপনি পার হয়ে এসেছেন। আপনি কিভাবে সেই স্বপ্নিল পথে সফলভাবে হেঁটে যাবেন, সেসবকিছু জেনে ফেললেন। এবার একটা সিরিয়াস কথা আপনার জন্যে!

সেটা শুনবার আগে চলুন একটা সুন্দর গান শুনে ফেলি। গানটির গীতিকার আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব, সুরারোপ করেছেন আবুল আলা মাসুম এবং কণ্ঠ দিয়েছেন মারুফ আল্লাম।

শুনেছি তোমার দয়ার পাথার
নেই তার কোন কূল
সে পাথারে হোক বিলীন আমার
জীবনের যত ভুল ॥

তোমার পাথার থেকে সবটুকু না-ই যদি দাও আমায়,
এক ফোঁটা জল দাও না ঝরিয়ে আমার আমলনামায়!
সেই জলে প্রভু বুকের কালিমা ধুয়ে মুছে হোক সাফ-
পোড়া হৃদয়ের গ্লানি ভুলে আমি হতে চাই নিষ্পাপ।
আমার হৃদয়-কাননে ফোটাও
ফিরদাউসের ফুল ॥

প্রতিটি ক্ষণেই আমি তো কেবল পাপই করেছি জমা
তুমিই বলেছো না হতে হতাশ, চাইতে তোমার ক্ষমা!
ডাকলে তোমায় সাড়া দেবে তুমি- কোরানে দিয়েছো বলে;
বুকে নিয়ে সেই আশা দুই চোখে দুফোঁটা অশ্রু গলে।
তোমার ওয়াদা রাখবে তুমি-ই,
তুমি যে প্রভু অতুল ॥

শোনা শেষ? একটা হাসি দেন তাইলে!

চলেন, এবার 'সিরিয়াস' কথাটা বলে ফেলি। কথাটা আমার নয়, বিশ শতকের অন্যতম স্মরণীয় মণীষী আশ-শা'রাওয়ী [র.]-এর। তিনি তাঁর তাফসিরগ্রন্থের একটা স্থানে খুব চিন্তা জাগানিয়া কথা বলেছেন:

..فما فائدة أن يكون معك سيف بتار.. دون أن توجد اليد القوية التي ستضرب به[১]

"আপনার কাছে তীক্ষ্ণ ধারালো তরবারি থেকে কী লাভ, যদি সেই তরবারি দিয়ে আঘাত করার মতো শক্ত হাত আপনার না থাকে?"

এবার আপনার কাছে আসি।

ধরুন, এই যে পাপ-পঙ্কিলতা-কদর্যতা, এ-সবকিছুই আপনার দুশমন। আপনি এতক্ষণ ধরে যা জানলেন, সেগুলো তরবারি, এই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে। কিন্তু... তরবারি পেয়ে যদি আপনি বসে থাকেন, আঘাত করার মতো শক্ত হাতের অধিকারী না হোন, তাহলে কিন্তু এই তরবারি কিছুতেই কাজে দেবে না! 'মাইন্ড ইট!'

শক্ত হাত মানে আপনার সুদৃঢ় ও সুসংহত একটি হৃদয়, যেটা সর্বক্ষণ পাপের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকবে, পাপের মুখোমুখি হলেই তার সাথে তাওবাহ'র তরবারি দিয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে লড়বে।

আপনার সেই শক্তিমত্তা অর্জনের জন্যে চাই অনুভব-অনুভূতির জমিনে দৃঢ়তার চাষ করা। সেই জমিনকে উর্বর করার জন্যে তাফসির ইবন কাসিরে উল্লিখিত এই কবিতা দিতে পারে সারের যোগান:

تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي * درج الجنان ونيل فوز العابد
أنسيت ربك حين أخرج آدما * منها إلى الدنيا بذنب واحد

আমরা কাব্যানুবাদ করে ফেলি:

আমলনামায় হাজারও পাপ জমিয়ে চলেছো প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
'আবিদ এবং জান্নাতী হবো'- এমন স্বপ্ন দেখছো তবু?
আচ্ছা, তুমি কি ভুলেই গিয়েছো সেই জান্নাত থেকেই প্রভু-
আদমকে বের করে দিয়েছেন একটি মাত্র পাপের কারণে?

খুব স্পষ্ট বার্তা!

জান্নাত থেকে আদম [আ.]-কে আল্লাহ্ তা'আলা বের করে দিয়েছিলেন শুধু একটি অবাধ্যতার কারণে। আমরা একটি দুটি নয়, অসংখ্য পাপ সাথে নিয়ে সেই জান্নাতেই

---

১ তাফসীর ইবন কাসীর: খ. ১ পৃ. ২৭৬

যাবার স্বপ্ন দেখছি!

পাপের মুখোমুখি হলেই আপনি নিজেকে এই কবিতাটা দিয়ে 'রিমাইন্ডার' দেবেন। নিজের সাথে কথা বলবেন। বেশ, ইন শা-আল্লাহ্ আপনি উদ্দীষ্ট শক্তিমত্তা অর্জন করবেন খুব সহজেই!

তাহলে,
আমরা শত্রুকে চিনলাম।
তরবারি হাতে পেলাম।
তরবারি দিয়ে আঘাত করার মতো শক্তিমত্তাও অর্জন করলাম।

এবার?
এবার আর কী? লড়াই শুরু হোক...
পাপের বিরুদ্ধে, পঙ্কিলতার বিরুদ্ধে, কদর্যতার বিরুদ্ধে।
এই লড়াইয়ের একটি শ্লোগান, একটি ইশতেহার... 'আমি নিষ্পাপ হতে চাই!'

বিষমাখা পুষ্প

খুব মনে পড়ে, শুক্লপক্ষের রাতে বাড়ির ছাদে চাটাই বিছিয়ে দাদাভাই আমাদের গল্প শোনাতেন। শ্রোতা বলতে তখন আমি, রুবাইয়া এবং নাসিম — তিন ভাই-বোন। হাজী মুহম্মদ মুহসীনের কথা ক্লাসে প্রথম শোনার পর বাড়িতে সবাইকে খুব উৎসাহ নিয়ে শোনাতে লাগলাম। ঐ বয়সটা এমনই, নতুন কিছু শেখার পরে বা নতুন কোনো বিষয় জানার পরে সেটা চারদিকে রাষ্ট্র করে বেড়াতে না পারলে দুই দন্ড স্বস্তি পাওয়া যায় না। দাদাভাই সে সময় আমার মুখে হাজী মুহসীনের কথা শুনে একদিন ছাদের ওপর বসে খুব সুন্দর করে আরেকজন দানবীরের গল্প শুনিয়েছিলেন: হাতেম তায়ী। তাঁর শেষ পরিণতি শুনে তো কতোবার কেঁদে বুক ভাসিয়েছি! তখন থেকে আমি আর রুবাইয়া একটা অঘোষিত প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছিলাম মুহসীন এবং হাতেম তায়ী হবার জন্যে! যত বড় হয়েছি, এই দুটো মানুষের প্রতি ঈর্ষার পরিমাণটাও বেড়েছে ক্রমশ। সেই ঈর্ষা জড়ানো ভালোবাসা থেকেই ফররুখ আহমদের সার্থক কাব্যনাট্য 'নৌফেল ও হাতেম' এক বসাতে শেষ করেছিলাম! সম্প্রতি তাফসীর কুরতুবীতে হাতেম তায়ীর উদ্ধৃত কবিতা[১] দেখে আবিষ্কার করলাম, এই মহানুভব মানুষটির ছিলো বিস্ময়কর কাব্যপ্রতিভা! মনে মনে খুব খুশি হলাম তাঁর আরেকটা গুণের পরিচয় পেয়ে। আল্লাহর কী ইচ্ছা, আরবি কবিতার বই ঘাঁটতে গিয়ে হঠাৎ পেয়ে গেলাম তাঁর কাব্য সংকলন 'দিওয়ান হাতিম আত-তায়ী'! এ যে মেঘ না চাইতেই জল! প্রাচীন সাহিত্য; যথেষ্ট

১ সূরা আন'আম (৬) এর ১১৮ নং আয়াতের তাফসীর। [তাফসীর কুরতুবী, খ. ৭ পৃ. ৭২]

মনোযোগ এবং পরিশ্রম দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হয়েছে। এই কাব্যসংকলনে হাতিম আত-তায়ীর বিশুদ্ধ মননের পরিচয় পেয়ে ইচ্ছে জাগলো তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানার। নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন সূত্র থেকে হাতিম আত-তায়ী সম্পর্কিত যেসব জানা-অজানা বিষয় নজরে এসেছে, সেগুলোকে সাজিয়েই 'বিষমাখা পুষ্প'র গল্পের আসর বসলো আজ।

পরিচয়

পুরো নাম: হাতিম ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন সা'দ ইবন আল-হাশরাজ ইবন ইমরাইল-ক্বায়স ইবন 'আদী। কন্যার নামানুসারে তিনি 'আবু সুফানাহ' (সুফানাহর পিতা) বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পুত্র 'আদী ইবন হাতিম রাসূলুল্লাহর [ﷺ] সাহাবীদের [রা.] একজন।[১] ইতিহাসে 'আদী বিখ্যাত হয়েছেন সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে 'আলী [রা.] কর্তৃক মু'আওয়িয়াহ [রা.]-এর নিকট প্রেরিত হয়ে।

পন্ডিতগণ বলে থাকেন, তায়ী বংশ থেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে তিনজন অতুলনীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে: দানশীলতায় হাতিম আত-তায়ী, দুনিয়াবিমুখ একান্ত 'ইবাদাতে দাঊদ ইবন নাসীর আত-তায়ী এবং কবিতার ক্ষেত্রে আবু তাম্মাম।[২]

দ্বীন

ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বেই হাতিম আত-তায়ী মারা যান।[৩] রাসূলুল্লাহ'র [ﷺ] বয়স যখন আট বছর (৫৭৮ ঈসায়ী), তখন তাঁর দাদা 'আব্দুল মুত্তালিব মারা যান এবং একই বছরে মারা যান হাতিম আত-তায়ী।[৪] তিনি ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী (নাসারা)। আল্লাহর বিচার, তাক্বদীর এবং অন্যান্য ঐশী নির্দেশাবলীতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।[৫]

আরেকটি মতানুসারে, হিজরী অষ্টম সনে তিনি মারা যান।[৬] এ বছরের যুলহিজ্জাহ

---

১ আল-মুফাসসাল ফী তারিখিল 'আরাব ক্বাবলাল ইসলাম, খ. ১৮ পৃ. ৩৭৮

২ আল-ওয়াফী বিল ওয়াফায়াত, খ. ৪ পৃ. ৮৬

৩ আল-মুফাসসাল, খ. ৭ পৃ. ২২১

৪ মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ, খ. ১ পৃ. ৩৩

৫ আল-মুফাসসাল, খ. ১১ পৃ. ১৫৪

৬ আল-উনাস আল-জালীল, খ. ১ পৃ. ২১১

মাসে মারিয়াহ ক্বিবতিয়াহ'র গর্ভে রাসূলুল্লাহর [ﷺ] সন্তান ইবরাহীম[১] জন্মগ্রহণ করেন।[২]

হাতিমের অনন্য বদান্যতা ও দানশীলতার গল্প

হাতিম আত-তায়ীর দানশীলতা ও পরোপকারিতার ব্যাপারে সকল ঐতিহাসিক একমত। আমরা এতদসংক্রান্ত দুটো বর্ণনা এখানে উল্লেখ করবো।

১. হাতিম আত-তায়ীর স্ত্রী নাওয়ারকে একবার হাতিম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হোল। তিনি বললেন:

"তাঁর প্রত্যেকটি কাজই ছিলো বিস্ময়কর। একবার আমাদের দুর্ভিক্ষ আক্রান্ত করলো। জমিন রুক্ষতায় ফেটে পড়লো এবং আকাশও হয়ে গেলো ধূসরিত। দুগ্ধদানকারীনি মায়েরা সন্তানদেরকে দুধ পান করানো থেকে সরে আসতে বাধ্য হন। উটগুলো অতিশয় কৃশকায় হয়ে পড়ে। সে সময় শীতের এক প্রখর রাতের অর্ধপ্রহরে আমাদের সন্তানগুলো ক্ষুধায় কান্না জুড়ে দেয়: আব্দুল্লাহ, 'আদ্দী এবং সুফানাহ। আল্লাহর শপথ, আমাদের এমন কিছু ছিলো না, যা দিয়ে তাদের সান্ত্বনা দেবো। হাতিম একজন সন্তানের দিকে এগিয়ে এসে কোলে তুলে নেন। আমি এক কন্যাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম। আল্লাহর শপথ, রাত্রির একটি অংশ অতিবাহিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের কান্না থামে নি। এরপর আমরা আঁশযুক্ত সিরীয় চাদর দ্বারা বিছানা পেতে দিলাম। আমরা সন্তানদের ঘুম পাড়িয়ে দিলাম। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, হাতিমও অন্য পাশে ঘুমিয়ে পড়লেন আর সন্তানরা ছিলো আমাদের মাঝে। হাতিম অতঃপর আমার দিকে এগিয়ে আসলেন এবং সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, যাতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। আমি তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ঘুমের ভান ধরলাম। হাতিম বললেন, 'কী হোল? ঘুমিয়ে পড়েছো?' আমি নীরব থাকলাম। তিনি বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে, সে ঘুমিয়ে গেছে।' অথচ আমার চোখে কোনো ঘুম ছিলো না। যখন রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো, তারকারাজি নিবু নিবু হয়ে এলো এবং সমস্ত প্রকৃতি-ও নিঝুম-নিস্তব্ধতায় নিমগ্ন হলো; তখন তাঁবুর এক প্রান্ত হঠাৎ উঁচু হতে দেখা গেলো। হাতিম বললেন, 'কে রে?' অতঃপর আগন্তুক চলে গেলো। ইতোমধ্যে রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। হাতিম [পুনরায়] জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কে?' [একজন মহিলা] বললেন, 'আমি আপনার

---

১ এক বছর দশ মাস বয়সে তিনি মারা যান। [সীরাত ইবন কাসীর, খ. ১ পৃ. ১০৪]

২ আল-উনাস আল-জালীল, খ. ১ পৃ. ২১১

প্রতিবেশীনি অমুক, হে 'আদীর পিতা! আমি আপনাকে ছাড়া কাউকে ভরসা ও সাহায্যের আশ্রয়স্থল মনে করি নি। আমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় নেকড়ে বাঘের মতো আর্তনাদ করতে থাকা কিছু শিশুর পক্ষ থেকে আপনার কাছে এলাম।' হাতিম বললেন, 'তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' নাওয়ার বললেন, আমি লাফিয়ে উঠলাম এবং বললাম, 'আপনি কী করলেন? ঘুমিয়ে পড়ুন! আল্লাহর কসম, আপনার সন্তানগুলো বিলাপ করছে আর তাদেরকে বুঝ দেয়ার মতো কিছু পেলেন না; অথচ এই মহিলা এবং তার সন্তানদের কিভাবে নিবৃত্ত করবেন?' হাতিম বললেন, 'থামো, আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকেও তৃপ্ত করবো ইনশা-আল্লাহ।' নাওয়ার বলেন, মহিলাটি দুই সন্তান কোলে এবং দুই পাশে চারজন সন্তানসহ আসছিলেন, মনে হচ্ছিলো যেনো কিছু বাচ্চা নিয়ে উটপাখি আসছে। হাতিম তার ঘোড়ার দিকে এগিয়ে এলেন এবং বর্শা দিয়ে গলায় আঘাত করলেন। অতঃপর চুলা জ্বালিয়ে দিলেন। এবার ছুরি নিয়ে এসে চামড়া তুলে ফেললেন এবং ছুরিটা মহিলাকে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, তোমার সন্তানদের পাঠাও। মহিলা পাঠিয়ে দিলেন। হাতিম বললেন, এই মৃত জন্তু থেকে শুধু কি তোমরাই খাবে, ছড়িয়ে থাকা আরো অসংখ্য ক্ষুধার্তকে ছাড়া? হাতিম বেরিয়ে পড়লেন, অতঃপর লোকেরা সবাই দলে দলে আসতে লাগলো। হাতিম একটা কাপড় জড়িয়ে এক পাশে শুয়ে থাকলেন আর আমাদের দেখতে লাগলেন। আল্লাহর কসম, তিনি একটা ক্ষুদ্র অংশও সেখান থেকে গ্রহণ করলেন না; অথচ তিনিই [ক্ষুধার তীব্রতায়] সবার চেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী ছিলেন [খাওয়ার জন্য]। এরই মধ্যে সকাল হয়ে এলো, দেখা গেলো কিছু হাড়গোড় ছাড়া খাদ্যের কোন কিছু আর অবশিষ্ট নেই।[১]"

২. ওয়াদ্দাহ ইবন মা'বাদ আত-তায়ী বর্ণনা করেন,

"হাতিম আত-তায়ী নু'মান ইবন মুনজির[২] এর নিকট আগমন করলে নু'মান তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন এবং কাছে টেনে নেন। আসার সময় তাকে কিছু উপঢৌকন প্রদান করেন; নগরীর মূল্যবান বস্তু ছাড়াও এর মধ্যে ছিলো স্বর্ণ ও রৌপ্য বোঝাই দুটি বাহন। হাতিম আত-তায়ী তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট আগমন করলে তায়ী বংশের বেদুঈন গরীবরা তাঁকে ঘিরে ধরে এবং বলে, ওহে হাতিম! তুমি বাদশাহর কাছ থেকে এসেছো সম্পদ নিয়ে আর আমরা আমাদের পরিজনদের কাছ থেকে এসেছি দারিদ্র্য নিয়ে। হাতিম বলেন, 'আসো আসো! আমার সামনে যা কিছু আছে সব

---

১ আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খ. ১ পৃ. ২২৮

২ হীরা রাজ্যের অধিপতি।

নাও!' এই বলে তিনি তাদেরকে বণ্টন করে দিতে লাগলেন। অতঃপর তারা সবাই নু'মান কর্তৃক প্রেরিত উপঢৌকনাদির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলো। এরই মধ্যে হাতিমের দাসী তুরাইফা এগিয়ে এসে তাঁকে বললেন, 'আল্লাহকে ভয় করুন! নিজের জন্যও কিছু জমা রাখুন! এসব লোকেরা তো কোনো স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা আর অবশিষ্ট রাখলো না। আর না অবশিষ্ট রাখলো কোন বকরী অথবা উষ্ট্র।' হাতিম আত-তায়ী তখন আবৃত্তি করে বললেন:

قالت طريفة ما تبقى دراهمنا ... وما بنا سرف فيها ولا خرق

إن يفن ما عندنا فالله يرزقنا ... ممن سوانا ولسنا نحن نرتزق

ما يألف الدّرهم الكاريّ خرقتنا ... إلا يمرّ علينا ثمّ ينطلق

إنا إذا اجتمعت يوماً دراهمنا ... ظلّت إلى سبل المعروف تستبق[১]

[তুরাইফা বলছে, আমাদের কোনো স্বর্ণমুদ্রা অবশিষ্ট থাকবে না। আমরা তো কোনো অপচয়ও করি নি, অনর্থক খরচও করি নি। আমাদের নিকট যা আছে তা যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ-ই আমাদের দান করবেন অন্যদের কাছ থেকে। (আল্লাহ ব্যতীত) আমরা নিজেরা নিজেদের দান করতে সক্ষম নই। 'কার' অঞ্চলের স্বর্ণমুদ্রা আমাদের ঝাঁপিতে জমা হয় কেবল এইভাবে যে, সেটা ঝাঁপি অতিক্রম করেই বণ্টিত হয়ে যায়। যখনই কোনোদিন আমাদের স্বর্ণমুদ্রা জমা হবে, কল্যাণের পথে সেটা অগ্রগামী হতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে।]

হাতিম নিরহংকার ছিলেন

আবু বাকর ইবন 'আইয়াশ বর্ণনা করেছেন: হাতিম আত-তায়ীকে জিজ্ঞেস করা হোল, আরবে আপনার চেয়ে দানশীল আর কেউ আছে কি? তিনি বললেন, প্রত্যেক আরবই আমার চেয়ে বেশি দানশীল।[২]

হাতিম প্রদর্শনেচ্ছু ছিলেন

হাতিম আত-তায়ীর অনুপম দানশীলতা এবং মহানুভবতা সত্যিই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আর তাঁর দানের মহাকাব্যিক উপাখ্যান ভালোবাসা ও ভালো লাগার অনন্য উপাদান। কিন্তু নিদারুণ হতাশ হলাম, যখন জানতে পেরেছি, তাঁর এই পরোপকার

---

১ মুখতাসার তারীখ দিমাশক, খ. ২ পৃ. ৩০৯

২ আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খ. ১ পৃ. ২৩০

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ছিলো না। বরং কেবল খ্যাতি ও প্রশংসার জন্যেই উদারহস্তে দান করেছিলেন। একটু খটকা লেগে গেলো, তবে শেষমেশ তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর অভিমত জানতে পেরে অনেক কষ্টে নিশ্চিত হলাম।

'আদী [রা.] প্রিয়নবীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন: 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাবা রক্তের বন্ধন অটুট রেখেছিলেন, অতিথির যত্ন নিয়েছিলেন এবং এই এই ভালো কাজ করেছিলেন।' রাসূল [ﷺ] বললেন, 'তোমার বাবা যা চেয়েছিলেন[১], তা তো পেয়ে গেছেন।[২]'

হাতিম-এর জীবন থেকে আমরা কী শিক্ষাটি পেলাম?

সামগ্রিক বিচারে আমরা হাতিম আত-তায়ীকে মহানুভবতার সুরভিত পুষ্প হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। কিন্তু এ পুষ্পের সুবাসিত মদিরায় হৃদয় মাতানো যায় না, কারণ তার পাপড়িগুলো লৌকিকতার বিষে মাখা। নিয়্যাত পরিশুদ্ধ করার সীমাহীন গুরুত্বের কথাটা আমাদের আরও একবার স্মরণ করিয়ে দেয় হাতিম আত-তায়ীর জীবনাচার। কেবল কল্যাণ ও পুণ্যের পথে নিবেদিত হওয়া-ই যে চূড়ান্ত সার্থকতা নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিখাদ উদ্দেশ্যই সফলতার পূর্বশর্ত;— হাতিম আত-তায়ী থেকে আমরা এ শিক্ষাই নিতে পারি।

আমাদের পূর্ববর্তী সালাফ আস-সালিহুন নিয়্যাত শুদ্ধ করার প্রতি এতোটাই গুরুত্বারোপ করতেন যে, অনেকেই তাঁদের লিখিত গ্রন্থের শুরুতে 'হাদীসুননিয়্যাহ' উল্লেখ করে দিতেন।[৩] حديث النية বা 'নিয়্যাতের হাদীস' বলতে বোঝায় আমাদের সকলের কাছে পরিচিত (সাহীহ আল-বুখারীতে সর্বাগ্রে উল্লিখিত) হাদীসটি:

'উমার ইবন আল-খাত্তাব [রা.] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] ইরশাদ করেছেন:

---

১ অর্থাৎ, 'দানের প্রশংসা'। এই ব্যখ্যাটি আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ-তে এসেছে। খ. ১ পৃ. ২২৭।

২ মুসনাদ আহমাদ: ১৯৩৯৩

৩ 'উমার [রা.] থেকেও এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা পাওয়া যায়: "যে ব্যক্তি কোনো গ্রন্থ রচনার ইচ্ছে পোষণ করে, সে যেন الأعمال بالنيات (হাদিসটি) দ্বারা তা শুরু করে।" [জামি' আল-'উলূম ওয়াল হিকাম, খ. ১ পৃ. ৫৯]

"

إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه

"নিশ্চয়ই প্রতিটি কাজ নিয়্যাত অনুযায়ীই গৃহীত হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই-ই পায়, যা সে নিয়্যাত করে। সুতরাং যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল [ﷺ]-এর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যেই পরিগণিত হবে। আর যার হিজরত দুনিয়া লাভের বা কোনো নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হবে, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই পরিগণিত হবে, যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।[১]"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মক্কা থেকে মদিনা-তে হিজরতের সময় মুমিনদের সবাই আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্যে এই ত্যাগ-কুরবানির নজরানা পেশ করলেও এক ব্যক্তি হিজরত করেছিলো মদিনার একজন রমণীকে বিবাহ করার জন্যে।

আ'মাশ [রা.] বলেন: "আমাদের মধ্যে এক লোক ছিলো, যে উম্মু ক্বাইস নাম্নী মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, কিন্তু মহিলা তাকে বিয়ে করতে অসম্মত হয়, এমনকি মদিনাতে হিজরত করে চলে আসে। এরপর লোকটি(ও) মদিনাতে হিজরত করে এবং (অবশেষে) তাকে বিয়ে করে। আমরা সেই লোকটির নাম দিয়েছিলাম (উম্মু ক্বাইসের মুহাজির)।[২]"

তার নিয়্যাত যেহেতু পরিশুদ্ধ ছিলো না, সে কারণেই এই দুর্গম পথ পাড়ি দেওয়ার কষ্ট, শত্রুর হাতে বন্দী হবার ঝুঁকি গ্রহণ — এতো ত্যাগ তার জন্যে কোন পুণ্য বয়ে আনলো না। একইভাবে, হাতিম আত-তায়ীর বদান্যতা, অকাতরে বিলিয়ে দেওয়ার মত হৃদয়ের প্রাশস্ত্য, আত্মত্যাগের মহাকাব্যিক দৃষ্টান্ত—কোনকিছুই চূড়ান্ত হিসেবের খাতায় একটি শূন্য বৈ কিছু বয়ে নিয়ে আসে নি।

নিয়্যাত পরিশুদ্ধ থাকলে স্বল্প 'আমালই মুক্তির কারণ হতে পারে, আবার বিপরীতে অধিক আমলও অর্থহীন হয়ে যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ [ﷺ] মু'আজ ইবন জাবাল [রা.]-কে ইয়ামানে প্রেরণের প্রাক্কালে উপদেশ দিচ্ছিলেন,

---

১ সাহীহ আল-বুখারী: ০১; সাহীহ মুসলিম: ৫০৩৬।

২ ফাতহুল বারী, খ. ১ পৃ. ১৩

"

أخلص دينك يكفيك العمل القليل

"তোমার দ্বীনকে একনিষ্ঠ করো। অল্প 'আমালই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে"।[১]

---

১ আল-মুসতাদরাক: ৭৮৪৪। হাকিম বলেছেন: হাদিসটি সনদের দিক থেকে সাহীহ। ইমাম বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে কিছুটা শাব্দিক ভিন্নতা সহ হাদিসটি এসেছে (أخلص دينك يكفيك القليل من العمل) এই বর্ণনায় হাদিসটি মুরসাল।

আত্মকথন

ব্যালকনিতে বসে আছি। আজকের সকালটা বুঝি একটু বেশিই সতেজ। কিছুটা হিম হিম ভাব, তার সাথে মৃদুমন্দ বাতাস, ডানদিকে আমগাছটাতে কয়েকটা চড়ুই'র কিচিরমিচির, সব মিলিয়ে বেশ ফুরফুরে অনুভব। আমি কুরআন পড়ছিলাম। সূরা কাহফ।

আম্মু আমার বুকশেলফ গুছিয়ে দিতে দিতে বলছিলেন, 'আরবি কবিতার বইগুলো বোধহয় অনেকদিন ধরো নি। এই তাকটা খুব পরিপাটি দেখা যাচ্ছে।' অনেক দিন যে ধরি নি, তা না, তবে একটা বিরতি কিন্তু দিয়েছি ঠিকই। আজকের 'টু-বি রেড লিস্টে' কোনো কবিতার বই ছিলো না আমার। তবু আম্মুর কথাটা মনে ধরলো, কুরআন পড়া শেষ করে 'উলয়া বিনত আল-মাহদী'র 'দীওয়ান' (কাব্যসঙ্কলন) হাতে নিলাম। তাঁর কবিতায় চোখ বুলাচ্ছি এই প্রথমবারের মতো। তাঁর একটি বিশেষ পরিচয়, তিনি আব্বাসীয় খলিফা আল-মাহদী'র কন্যা এবং হারুন-আর-রাশীদ-এর বোন। চমৎকার সব কবিতা! এতদিন কেন মনোযোগ দিলাম না, নিজেকে খুব বোকা মনে হোল। আব্বাসী যুগের প্রচলিত সাহিত্যধারার সাথে বিশাল একটা পার্থক্য আছে তাঁর কবিতায়! প্রতিপক্ষের নিন্দা-কুৎসা রটনা, বংশীয় অহঙ্কার ও কীর্তিগাঁথা রচনা, রাজস্তূতি ও স্তাবক-বন্দনা — এই ধারা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত তো বটেই, আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সরল কাব্যিক রেখাতেও তিনি অবস্থান করেন নি, বোধের বাঁশিটা বাজিয়েছেন একেবারে স্বতন্ত্র অনুভূতির বটবৃক্ষের ছায়ায়। এই যেমন:

القلب مشتاق إلى ريب * يا ربّ ما هذا من العيب
قد تيمت قلبي فلم أستطع * إلاّ البكا يا عالم الغيب

আমি কাব্যানুবাদের চেষ্টা করেছি [মাত্রাবৃত্ত ছন্দে]:

আমার হৃদয় সন্দেহ আর সংশয়ে পড়ে যায়
প্রভু! এ কেমন বিব্রতকর দুঃসহ অনুভব!
আমার মনটা ওদিকেই ঝুঁকে যেতে যখনই চায়,
কান্না ছাড়া তো আমার কিচ্ছু করার থাকে না, রব!

কী সাংঘাতিক! আমি কবিতাটা পড়ছিলাম, মনে মনে কাব্যানুবাদ সাজাচ্ছিলাম, আর অবচেতনেই বিড়বিড় করে বলছিলাম, 'বোন রে! আমার কথাগুলো আপনি এত্ত আগেই বলে ফেললেন ক্যামনে!'

সংশয়ের আবর্তে ঘূর্ণায়মান মুসলিম তরুণদের অভিব্যক্তি গড়ের ওপর এমনই তো বোধহয়! এ নিয়ে আমার দর্শন আরও মজবুত হোল এই কবিতাটা থেকে। শাইত্বান যখন বিশ্বাসের সফেদ চাদরে দাগ ফেলতে চায়, তখন আল্লাহর কাছেই আমাদের অসহায়ত্বের স্বীকৃতি আর আশ্রয় প্রার্থনার বিনীত আকুতি পেশ করে অশ্রু নিবেদন করাটাই প্রশান্তির শেষ নিয়ামক। আল্লাহও তা-ই শিখিয়ে দিয়েছেন আল-কুরআনে:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

"আমাদের রব্ব! আমাদেরকে পথ দেখানোর পর তুমি আমাদের হৃদয়গুলোকে পুনরায় বক্র করে দিও না! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে রহমত দান করো। তুমি তো উদার-মহান দাতা![১]"

'উলয়ার কবিতায় বিরতি দিলাম, কেনো জানি মনে হোল, এক বসাতেই সম্পূর্ণ ভালো লাগা শেষ করা ঠিক হবে না! সময়ে সময়ে প্রয়োজনানুসারে ভালো লাগাটাকে একদম নবীনতম অনুভূতির জালে ধরার লোভ থেকে আরেকটা বই ধরলাম।

'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারাক [রা.]-এর 'দীওয়ান' বেশ অনেকবার পড়েছি। কিন্তু অন্য আরো কিছু বইয়ের মতো এই বইটাও আমার কাছে বারবার পড়ার পরেও মনে হয় নতুন কিছু। আজকে একটা পঙক্তি খুব ভাবালো:

---

১ সূরা আলে 'ইমরান ৩:৮

أرى أناسا بأدنى الدين قد قنعوا * ولا أراهم رضوا في العيش بالدون[১]

ষান্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এটারও একটা কাব্যানুবাদ দাঁড়িয়ে গেলো মনে মনেই:

অনেককে দেখি দ্বীনের অল্প পালন করেই তুষ্ট রয়,
দুনিয়ার ভাগে অল্প পড়লে তারা-ই আবার রুষ্ট হয়!

আসলেই তো! দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে আমাদের অমনোযোগিতা ও অবহেলা কিন্তু একটুও ভাবায় না আমাদেরকে। অবলীলায় এবং খুব স্বাভাবিক ভাবেই দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা ও আবেগ-অনুরাগের পরিচর্যা কমিয়ে দিচ্ছি আমরা। এই অবহেলা এবং ছাড় দেওয়ার মনোবৃত্তি কিন্তু বৈষয়িক কোনো ব্যাপারে সেভাবে ঘটে না! একেবারে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের জন্যে সঞ্চয় ও অর্জনে সামান্যতম ত্রুটিটুকুও পরাহত করতে আমরা যতটা সচেতন, চিরস্থায়ী ও চূড়ান্ত জীবনের জন্যে কিছু পাথেয় কুড়িয়ে নেওয়ার জন্যে আমরা কি ততটুকু সচেতন?

আমি নিজেকে প্রশ্ন করে যাচ্ছি...

আল্লাহ রহম করুন সেই আলোকিত কবিদের; যাঁরা আমাদের বিশ্বাস ও বিশুদ্ধ অনুভূতিগুলোকে সতেজ ও সজীব রাখার উপাদান রেখে গেছেন, যাঁরা আমাদেরকে নশ্বর পিছুটানের মরীচিকা ভুলে অবিনশ্বর স্বপ্নপুরীর জন্যে তৈরি হবার প্রণোদনা যোগান প্রতিনিয়তই।

ঠিক সে সময় আল-কুরআনের সেই আয়াত দুটো যেনো তীর হয়ে এসে বিঁধে গেলো বোধিবক্ষে:

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى.

"বরং তোমরা পার্থিব জীবনকেই বেশি অগ্রাধিকার দিচ্ছো। অথচ আখিরাতের জীবন হোল উত্তম এবং স্থায়ী।[২]"

---

১ দীওয়ান ইবনুল মুবারাক, পৃ. ৪৮

২ সূরা আল-আ'লা ৮৭:১৬, ১৭

তিনটি ব্যামো: ত্রিফলা প্রতিষেধক

ত্বালিবুল 'ইলম তথা 'Students of Knowledge' যাঁরা, তাঁরা সচরাচর যে তিনটি সমস্যার মুখোমুখি হন, সে সম্পর্কিত তিনটি কবিতা আমরা এখানে কাব্যানুবাদ করবো, বিইজনিল্লাহ। শেষ দুটোতে আক্ষরিক অনুবাদের বৃত্তে কেন্দ্রবিন্দু ঠিক রেখে ব্যাসার্ধ কিছুটা বাড়াতে হয়েছে, পাঠকের সহজাত বোধগম্যতার বৃত্তকে শিল্পিত করার জন্যে। তিনটি কবিতা-ই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অনূদিত।

(১) আমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে

এই একই সমস্যার ব্যাপারে ইমাম আশ-শাফি'ঈ [রা.] তাঁর উস্তায ওয়াকী'র কাছে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি যে সমাধান দিয়েছেন, সেটা কবিতা আকারেই বর্ণনা করছেন।[১]

شكوت إلى وكيع سوء حفظي

فأرشدني إلى ترك المعاصي

وأخبرني بأن العلم نور

ونور الله لا يهدى لعاص

"প্রিয় উস্তায ওয়াকী'র কাছে করলাম অভিযোগ-

---

১ দীওয়ান শাফি'ঈ, পৃ. ৮

আমার স্মরণশক্তি কমেছে, কিভাবে সারবে এ রোগ?
তিনি বললেন, 'তুমি পাপ ছাড়ো'
এরপর তিনি বললেন আরো-
বৎস! 'ইলম হলো এক 'নূর' আল্লাহ তা'আলার!
পাপীদের দেয়া হয় না কখনো এই নূর উপহার!"

(২) আলসেমি কাটিয়ে উঠতে পারি না

'ইলম অর্জনের পথে অলসতা মারাত্মক একটি বিষফোঁড়া। ছাত্রজীবনে এটার 'ইনফেকশন' একটু বেশিই ভয়াবহ হয়ে থাকে।

একজন ছাত্রের সুফলা স্বপ্নের মাঠে অহেতুক অলসতা একদম পাকা ধানে মই দেয়ার মতো। অথবা বাড়া ভাতে ছাই দেয়ার মতো। নানা সময় নানা অজুহাত দাঁড় করানো আলস্যের প্রাণ।

ইমাম আয-যাহাবী এ সংক্রান্ত সুন্দর একটি কবিতা নিয়ে এসেছেন[১] :

إذا كنت تؤذى بحر المصيف
ويبس الخريف وبرد الشتا؟
ويلهيك حسن زمان الربيع
فأخذك للعلم قل لي متى؟

"এসেছে গ্রীষ্ম; তুমি বলো, 'আহ! খরতাপে পুড়ে যাই!
এমন গরমে কিভাবে পড়ার ফুরসত বলো পাই?'
শীত ঋতু এলে বলো, 'আহা এই হিম শীতলের মাসে,
কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে কি পড়ার চিন্তা মাথায় আসে?'
শরৎ ঋতুর উদাসী পরশে তুমি হও ভুলোমনা,
পড়ার টেবিলে আনমনা হয়ে করে যাও কল্পনা।
বসন্ত এলো, বেশ! চারিদিকে রূপের মাধুরী দেখে-

---

১ সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, খ. ১৭ পৃ. ১০৬

আমার স্মরণশক্তি কমেছে, কিভাবে সারবে এ রোগ?
তিনি বললেন, 'তুমি পাপ ছাড়ো'
এরপর তিনি বললেন আরো-
বৎস! 'ইলম হলো এক 'নূর' আল্লাহ তা'আলার!
পাপীদের দেয়া হয় না কখনো এই নূর উপহার!"

(২) আলসেমি কাটিয়ে উঠতে পারি না

'ইলম অর্জনের পথে অলসতা মারাত্মক একটি বিষফোঁড়া। ছাত্রজীবনে এটার 'ইনফেকশন' একটু বেশিই ভয়াবহ হয়ে থাকে।

একজন ছাত্রের সুফলা স্বপ্নের মাঠে অহেতুক অলসতা একদম পাকা ধানে মই দেয়ার মতো। অথবা বাড়া ভাতে ছাই দেয়ার মতো। নানা সময় নানা অজুহাত দাঁড় করানো আলস্যের প্রাণ।

ইমাম আয-যাহাবী এ সংক্রান্ত সুন্দর একটি কবিতা নিয়ে এসেছেন[১] :

إذا كنت تؤذى بحر المصيف
ويبس الخريف وبرد الشتا؟
ويلهيك حسن زمان الربيع
فأخذك للعلم قل لي متى؟

"এসেছে গ্রীষ্ম; তুমি বলো, 'আহ! খরতাপে পুড়ে যাই!
এমন গরমে কিভাবে পড়ার ফুরসত বলো পাই?'
শীত ঋতু এলে বলো, 'আহা এই হিম শীতলের মাসে,
কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে কি পড়ার চিন্তা মাথায় আসে?'
শরৎ ঋতুর উদাসী পরশে তুমি হও ভুলোমনা,
পড়ার টেবিলে আনমনা হয়ে করে যাও কল্পনা।
বসন্ত এলো, বেশ! চারিদিকে রূপের মাধুরী দেখে-

---

১ সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, খ. ১৭ পৃ. ১০৬

প্রকৃতির প্রেমে পড়ে যাও তুমি পড়াশোনা সব রেখে।
এভাবেই যদি বন্ধু তোমার সারাটি বছর কাটে;
বলো তো তাহলে জ্ঞান আহরণে বসবে কখন পাঠে?"

(৩) পড়ার সময় নোট করার অভ্যাস না থাকা

কোনো গ্রন্থ অধ্যয়নের পরে, কোন জ্ঞানীর সংস্পর্শে নতুন কিছু জানার পরে, অথবা সহসা কোনো ভাবনার উন্মেষ নিজের ভেতরে অনুভূত হলে, আমাদের উচিৎ সেটা তখনই নোট করে নেয়া। নোট করার অভ্যাস না থাকলে অনেক জ্ঞাত ও সহজাত বিষয়ও আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ইবনু 'উজাইবাহ তাঁর তাফসীরগ্রন্থে এরকম একটি কবিতা বর্ণনা করেছেন।[১] কোনো বিষয়ে জানার পরে নোট করে নেয়া যে কত বেশি প্রয়োজন, এটা কবিতার প্রতিপাদ্য।

العلم صيد والكتابة قيده
قيّد صيودك بالحبال الواثقة
فمن الحماقة أن تصيد غزالة
وتتركها بين الخلائق طالقة

"ধরো কোন এক শিকারী শিকার করতে গিয়েছে বনে
একটা হরিণ শিকার করলো অতীব সংগোপনে
শিকারী ভাবলো, পেয়েছি এবার পালায় কিভাবে দেখি!
এদিকে সুযোগে পালালো হরিণ; শিকারী অবাক, 'এ কি'!
অথচ শিকারী শিকার পেয়েই ভালো করে যদি বাঁধে-
অনেক আশার হরিণটা তার পালাতো কি আর সাধে?
তুমিও তেমনি জ্ঞানের শিকারী, জ্ঞানকে শিকার করে
লেখার বাঁধনে আটকিয়ে নাও মনের খাঁচায় ভরে
অন্যথা সেই জানা জিনিসটা পালিয়েই যদি যায়
শিকারীর মতো তুমিও করবে বৃথা শুধু হায় হায়!"

---

১ আল-বাহর আল-মাদীদ, খ. ১ পৃ. ৩৬৯

তিনি এক মজার শিক্ষক

প্রিয় নবীজি [ﷺ] কেবল মজার মানুষই ছিলেন না, ছিলেন একজন সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষক এবং দক্ষ শিক্ষক-ও! তাঁর অভিনব শিক্ষণ-পদ্ধতির একটি গল্প আমরা অনুবাদ করবো, আত-তাফসীর আত-তাবারী থেকে।[১] গল্পটি শোনার আগে আমাদের একটু জেনে রাখা প্রয়োজন, এটি কোন্ আয়াতের প্রেক্ষাপটে এসেছে। আয়াতটি হচ্ছে:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى

"তোমরা সালাতসমূহের ব্যাপারে মনোযোগী হও, মধ্যবর্তী সালাতের ব্যাপারেও।[২]"

এখানে 'মধ্যবর্তী সালাত' (الصَّلَاةِ الْوُسْطَى) বলতে আল্লাহ কী বুঝিয়েছেন, সে ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত আছে। তবে রাসূলুল্লাহর [ﷺ] হাদিস এবং ইবন 'আব্বাস, 'আয়িশা, 'আলী ইবন আবি তালিব, আবূ হুরায়রা [রা.] প্রমুখ সাহাবীর বক্তব্যের ভিত্তিতে অধিকাংশ মুফাসসির মত দিয়েছেন যে, এখানে আসরের সালাতের কথা বলা হয়েছে।[৩] সাধারণ বোধ-বুদ্ধিতেও তা-ই মনে হয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের

---

১ আত-তাফসীর আত-তাবারী, খ. ৫ পৃ. ১৯৬

২ সূরা আল-বাক্বারাহ ২:২৩৮

৩ তাফসীর তানতাওয়ী, খ. ১ পৃ. ৪৩৬

মধ্যে আসরের অবস্থান একেবারে মাঝামাঝি।

এবার সরাসরি গল্পে চলে যাই। একজন সাহাবী[১] বলছেন:

আমি তখন ছোট কিশোর। আবূ বাকর ও 'উমার [রা.] আমাকে রাসূলুল্লাহ'র [ﷺ] কাছে পাঠালেন 'মধ্যবর্তী সালাত' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে।

অতঃপর নবীজি [ﷺ] আমার কনিষ্ঠা আঙ্গুলটি ধরে বললেন: 'এটা হোল ফাজর'।

এরপর ঠিক তার পাশের আঙ্গুল ধরে বললেন: 'এটা হোল যোহর'।

এবার ধরলেন বৃদ্ধা আঙ্গুল, বললেন: 'এটা হোল মাগরিব'।

তারপর ঠিক তার পাশের আঙ্গুল ধরে বললেন: 'এটা হোল 'ইশা'!

এবার রাসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাকে বললেন: 'বল তো, তোমার কোন্ আঙ্গুলটা বাকী আছে?'

আমি বললাম: 'মধ্যমা আঙ্গুল'।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন: 'বল তো, কোন্ সালাতটা বলা বাকী আছে?'

আমি বললাম: 'আসর'।

নবীজি [ﷺ] বললেন: 'ঐ তো! ওটাই আসর!''

শিশুদের মন নিয়ে খেলা করার গুণটা আসলেই অনন্য! দেখুন, প্রিয় নবীজি [ﷺ] এমনভাবে শিশুটিকে বোঝাচ্ছেন, যাতে তার হৃদয়ে উদ্দীষ্ট বিষয়টা একেবারে গেঁথে যায়। একটি বাক্যে বা কথায় 'আসর সালাত' বলে না দিয়ে আঙ্গুল ধরে ধরে বোঝালেন, আর শিশুটাও খুব চমৎকারভাবে এবং আনন্দের সাথে বুঝে নিতে পারলো। আরেকটা বিষয় লক্ষণীয়, তাঁর পাঠনের ধারাবাহিকতাও এমনভাবে গোছানো, যাতে শিশুটি নিজেই উত্তর বের করে আনতে পারে!

১ তাফসীরে নির্দিষ্ট কোনো নাম উল্লেখ করা হয় নি।

একটি স্বপ্নের বেড়ে ওঠার গল্প

দু হাজার দশ সালের কোনো এক শুভদিনে অনলাইনে পরিচিত হয়েছিলাম প্রিয় মানুষ, প্রিয় শিল্পী মারুফ আল্লাম ভাইয়ার সাথে। আমি তখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি। তখন বিভিন্ন অনলাইন ম্যাগাজিনের বেশ সমাদর ছিলো। আমার কাঁচা হাতের কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিলো সেসব ম্যাগাজিনে। ভাইয়াও ওখানে লিখতেন নিয়মিত। আমার পঁচা সব লেখা সত্ত্বেও যে ক জন বিশাল হৃদয়ের মানুষ[১] উৎসাহ

---

১ পাদটীকা লেখার সুযোগ যেহেতু পেয়েছি, এখানে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ না করলে আমি নিজেকে অকৃতজ্ঞ মনে করবো। সর্বাগ্রে যে দুটো নাম আসবে, তাঁরা হলেন নূর আয়েশা সিদ্দীকা আপু (যিনি আমার কাছে 'গদ্যের জীবনানন্দ') এবং এনামুল হক স্বপন ভাইয়া। এই প্রবাসী লেখকদম্পতি লোহিত সাগরের ওপার থেকে ভালোবাসার ঢেউ তুলতেন আমার বঙ্গোপসাগরে। কয়েক বছর ধরে তাঁদের সাথে কোন যোগাযোগ নেই। যেখানেই থাকুন, আল্লাহ তাঁদের ভালো রাখুন। আমার কিশোরবেলার প্রথম মুগ্ধতা মাহমুদুল ইসলাম স্যারের নামটা এখানে শ্রদ্ধার সাথে স্মর্তব্য। রাবি'র ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক, খ্যাতিমান কবি ও গবেষক ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ আমার কবিসত্তার প্রথম আবিষ্কারক। তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমাকে গদ্যের পাশাপাশি পদ্যে স্বচ্ছন্দ করেছে। আলজেরিয়ায় বাঙলাদেশ মিশনের সিনিয়র কর্মকর্তা শাহজাহান চাচ্চুর পুত্রবাৎসল্য আমাকে আজও মাঝেমাঝে ঘোরের মধ্যে ফেলে দেয়। কবি ও নির্মাতা হাসান আল-বান্না ভাইয়ার আন্তরিক অনুপ্রেরণাও কখনো ভুলবার নয়। তানযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশনের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ড. আব্দুল্লাহ আল-মামুন স্যার, তানযীমুল উম্মাহর মূল ক্যাম্পাসের তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল আ খ ম মাসুম বিল্লাহ স্যার [বর্তমানে ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর], ভাইস প্রিন্সিপ্যাল আবূ নাঈম স্যার [বর্তমানে 'আরবি শাখা'র প্রিন্সিপ্যাল], কো-অর্ডিনেটর মাশহুদুল আলম স্যার [বর্তমানে ইস্টার্ন ক্যাম্পাসের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল] এবং বিলাল হোসাইন নূরী স্যার (আমার ছন্দগুরু) [বর্তমানে মূল ক্যাম্পাসের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল]- এঁদের কাছে আমার লেখকজীবন বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের উৎসাহ (অনেক ক্ষেত্রে 'প্রশ্রয়') ও সহযোগিতার কারণেই তানযীমে কাটানো দুইটি বছর আমার কবিতাজীবনের স্বর্ণালী অধ্যায়। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী (সম্ভবত এখন

"কাফনের কাপড়টাকে গায়ে জড়াবার আগে
ইহরাম গায়ে বাঁধার সুযোগ করে দিও
মরণের আগে একবার কাবার ধারে নিও...
বেশি কিছু চাই নি আমি, চেয়েছি কাবার ধারে
ঝরাব নয়ন-গলা পানি
মনের ধারে যুগে যুগে জমে থাকা পাপের সারি,
মুছে নেবো মনের যত গ্লানি..."

আমি নিজেও জানি না, কিভাবে সারাদিন এই গান মুখে লেগে থাকতো আমার।

আল্লাহর-ই ইচ্ছা, গানটা গাইতে গিয়েই সাধ ও স্বপ্নের সবগুলো রেখা আস্তে আস্তে সেই পবিত্র ভূমির কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে মিলে যেতো! প্রিয়নবীজির [ﷺ] প্রতি নিদারুণ ভালোবাসা তো আজন্ম লালন করে এসেছি, এবার সেই প্রেম-বৃক্ষটা ফুলে-ফলে আরো বেশি সতেজ-সজীব হতে শুরু করে। হাঁটতে-চলতে, ঘুরতে-ফিরতে আর উঠতে-বসতে কেবলই বায়তুল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে চোখের পানি ঝরাবার স্বপ্ন, প্রিয় নবীজিকে [ﷺ] সব আবেগ-উচ্ছ্বাস মিশিয়ে একটি সালাম প্রদানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা! সবুজ গম্বুজের পাশে দাঁড়িয়ে হৃদয়াবেগ উজাড় করে একটি কবিতা নিবেদনের অদম্য বাসনা! বদর আর উহুদের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে বুক ভরে একটি তাকবীর ধ্বনি তোলার জন্যে আকুলতা! জাবালে নূরের সুউচ্চ শিখরে, হেরা গুহার সম্মুখে ইতিহাস রোমন্থন করতে করতে বিড়বিড় করে 'ইক্বরা বিসমি রব্বিকাল্লাযী খালাক্ব' পড়ার ব্যাকুল অভিলাষ!

অবাক কান্ড, আমি আমার নিত্যদিনের দু'আয় কেবল এই গান গেয়েছি নীরবে। রাত্রির নিঝুম নিস্তব্ধতায় একা একা গেয়েছি আর অশ্রু ঝরিয়েছি অনুপম ভালো লাগায়।

দাদা-দাদুর মুখে গল্প শুনে শুনেই আশৈশব আমার চোখে ঘুম এসেছে। হাজ্ব থেকে ফিরে তাঁরা যখন প্রতিনিয়ত তাঁদের সফরের অভিজ্ঞতার কথাগুলো বলতেন, কেমন তন্ময় হয়ে শুনতাম। বায়তুল্লাহ যিয়ারাতের স্বপ্নফুল ওভাবেই পাঁপড়ি মেলতে শুরু করেছিলো। তারপর শুনলাম আব্বুর মুখে। প্রেমজ্বরে আক্রান্ত হলাম দারুণভাবে। স্বপ্নের থার্মোমিটারে ব্যাকুলতার পারদ খুব অস্থিরভাবে উঠানামা শুরু করেছিলো তখনই।

অষ্টম শ্রেণির শেষদিকে আব্বুর কাছ থেকে উপহার পেলাম (আব্বুও তাঁর এক ছাত্র থেকে উপহার পেয়েছেন) আবু তাহের মেসবাহ রচিত 'বায়তুল্লাহর মুসাফির'। আমার জীবনে পড়া সেরা বইগুলোর একটি। লেখকের আবেগ-অনুভূতির শতভাগ-ই পাঠকের শিরা-উপশিরায় সঞ্চারিত হতে পারে, এই সত্যটা আমি প্রথম আবিষ্কার করেছি 'বায়তুল্লাহর মুসাফির' পড়ে। এই বই আমার তৃষ্ণাকে আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দিলো।

ক

নবম শ্রেণিতে চলে এলাম ঢাকা। ভাইয়াকে সরাসরি দেখার সুযোগ হয়েছে ক্যাম্পাসে আয়োজিত 'নাতে রাসূল সন্ধ্যা'য়। আমার মুখে তখনো সেই গান কোনোভাবেই বিশ্রাম নিতে রাজি হয় নি। সবটুকু আবেগ আর অনুরাগ মিশিয়ে কাতর কণ্ঠে প্রিয়তম মালিককে বারবার হৃদয়ের আকুতি জানিয়েছি এই গান গেয়েই। আমি তখনো জানতাম না, আল্লাহ কতো তাড়াতাড়ি অধমের দু'আয় সাড়া দিচ্ছেন।

পরের বছর, যখন দশম শ্রেণিতে পড়ি, দাদা-দাদুর 'উমরাহ-তে যাবার কথা। দুজনে এর আগে হাজ্ব পালন করে এসেছেন। তবে এবারের উদ্যোগটা মেজো আব্বু এবং মেজো আম্মুর নেয়া। একজন অনেকদিন 'বাবা-মা'কে দেখেন না, আরেকজন 'মিস করেন' শ্বশুর-শাশুড়ী-কে। প্রবাস জীবনে বড়ো হওয়া আমাদের দুই ভাই-বোনও[১] এখনো তাদের দাদা-দাদুকে দেখে নি। তাঁদের সঙ্গে প্রথম বায়তুল্লাহ যিয়ারতে যাচ্ছেন ছোট আম্মু, দুই পিচ্চি[২] সহ। বাড়ির এই বিশাল একটি অংশের এমন সৌভাগ্যের খবরে আমি খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়লাম। আহা, আমিও যদি তাঁদের সাথী হতে পারতাম! বিষণ্ণতার প্রহরগুলো একেবারেই কাটছিলো না তখন। আল্লাহর হয়তো ভিন্ন পরিকল্পনা ছিলো, সে বছর তাঁরা কী যেন জটিলতায় ভিসা পান নি।

একদিন উদাসী বিকেলে লাইব্রেরিতে গন্তব্যহীন পড়াশোনায় মগ্ন ছিলাম। কিছুক্ষণ এই বই নেই, কিছুক্ষণ ওই বই। কোনোটাতেই স্থিরতা আসে না। সেলফে হঠাৎ

---

১ লেখাটি যখন লিখছি, তখন সাহিল ও সুবাইতার জন্ম হয় নি। এখন ওরা চার ভাই-বোন: সুহাইমা, সাহিম, সাহিল, ও সুবাইতা।

২ তখন ছোট আম্মুর কোলজুড়ে তাজরিবাহ আসে নি। এখন ওরাও তিন ভাই-বোন: নাশিত, সামিত ও তাজরিবাহ।

একটা বইয়ের নামে চোখ আটকে গেলো: 'সৌরভের কাছে পরাজিত'। বের করে আনলাম। ছোটগল্পের বই। লেখক আল মাহমুদ। আল মাহমুদের কোনো গদ্য ইতোপূর্বে আমি পড়ি নি। 'সৌরভের কাছে পরাজিত' গল্পগ্রন্থ দিয়েই মূলত আবিষ্কার করেছিলাম, আল মাহমুদ গদ্য ও পদ্য দুদিকেই অনবদ্য। এই গল্পগ্রন্থের একটা গল্প আমাকে কাঁদিয়েছিলো। একটা গল্প আমি কদিন পরপর পড়তাম আর চোখ আর্দ্র করে আনতাম। গল্পের নাম 'একটি চুম্বনের জন্যে প্রার্থনা'। হাজে্র সময় হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের রুদ্ধশ^াস স্মৃতিকথাকে কী অনন্য শৈল্পিকতার ঠাসবুননে নির্মাণ করেছেন কবি! আমার উতরোল সিন্ধুতে জলোচ্ছ্বাস এনে দিলো সেই গল্পটা। সেই জলোচ্ছ্বাসে আমার সব বৈষয়িক সাধ-অভিলাষ ভেসে গেলো নিমেষেই।

গ্রীষ্মের ছুটিতে গেলাম বাড়িতে। মাহমুদ স্যার তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকে কক্সবাজার ট্যুরে যাবেন। খুব ইচ্ছে হোল আমাকেও সাথে নেবেন। নাহ! আমি তো কোনোভাবেই রাজি হই না। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, আল্লাহর ঘর দেখার আগে ট্যুর-ফ্যুর সব বাদ। স্যার যথারীতি মান-অভিমানের দোলাচলে দুলতে শুরু করলেন। আমিও নির্বিকার। তবে আব্বুর প্রচেষ্টায় তাঁর অভিমান ভাঙাতে পেরেছি শেষমেশ।

খ.

পুকুরের পূর্বপাড়টিতে যেখানে খড়ের স্তূপ, গাছ-গাছালির নিবিড় ছায়াঘেরা স্থানটি, গ্রীষ্মের সময়টাতে ওখানে পেয়ারা গাছের নিচে দাদু সুযোগ হলেই চাটাই বিছিয়ে কুরআন পাঠ করতে বসেন। ঝিরিঝিরি বাতাসে গা এলিয়ে দাদুর পাশে বসে গল্প করতে বসে যেতাম আমিও।

ঢাকায় আসার পর আমার সেই সোনালী বিকেলগুলো খুব 'মিস' করেছি। এবার তাই দাদুকে একটু বেশি সময় দিতে টান অনুভব করলাম। এবার অবশ্য আমার ভালোবাসায় ভাগ বসানোর জন্যে নাতি-নাতনিদের সংখ্যা বেড়েছে। দাদী-নাতির গল্প বেশ জমেছে তখন। দাদাভাইও আছেন সাথে, একটা মোড়ায় বসে চিরাচরিত অভ্যাস মতো খুব মনোযোগ দিয়ে বাসি কোনো পত্রিকার উপ-সম্পাদকীয়তে চোখ বুলাচ্ছিলেন।

আহ! কতদিন পর দাদু আমার চুলে বিলি কাটছেন! আমাদের মধ্যকার কথোপকথনগুলো চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষাতেই তুলে দেই। সঙ্গে প্রমিতানুবাদ।

অ নাতি, ছারর ফোঁয়ারে ন যছ্ ক্যা? হ ছাই! (নাতি, স্যারের সাথে যাস্ নি কেনো? বল্ তো!)

প্রথমে খুব অপ্রস্তুত হলাম। কী জবাব দেবো? দাদু নন শুধু, আমাদের পরিবারের সবাই-ই তখন স্যারের অনুরক্ত। সে এক আশ্চর্য শক্তি তাঁর, সবাইকে এত্তো এত্তো কাছে টেনে নিতে পারতেন! আমাকে কেনো এতো বেশি ভালোবাসা দিয়েছিলেন, জানি না। আমি আমতা আমতা করে খুলে বললাম হৃদয়ের অব্যক্ত অনুভূতিটা। আরো বললাম তাঁদের উমরাহ যাবার সংবাদে আমার মন খারাপের কথা। জানালাম এই গানের কথা, গানটা বুকে জড়িয়ে কান্নার কথা। দাদু তো অবাক! একেবারে থ মেরে চেয়ে রইলেন।

: এ হথা তইলে! আঁরে এথদিন ন উনালি ক্যা? (এ কথা তাহলে! আমাকে এতদিন শোনাস্ নি কেনো?)

: ব্যাক্কুনে আবার আঁসাআঁসি গরিবঅ আঁর ফলাই উইনলে, ইথাল্লাই। (সবাই আবার হাসাহাসি করতে পারে আমার পাগলামোর কথা শুনলে, সে জন্যে।)

: এন্নেকি ত! উগগা গান মেইনষরে এত উতালা বানাইত ফারে দে! আঁরে উনাইছ তোর বিয়াক। (তাই নাকি! একটা গান মানুষকে এত উতলা করতে পারে! আমাকে তোর সবকিছু শোনাবি।)

দাদার দিকে তাকিয়ে,

: উইন্ননা তোঁয়ার নাতির হথা? (শুনেছো তোমার নাতির কথা?)

: উনিইইর! নোয়া হথা না? আঁরা অজত যেবশশতিয় ত হেন্দিল ইথে! (শুনছিইই! নতুন কথা নাকি? আমরা হাজ্বে যাবার সময়ও তো কেঁদেছিল সে!)

আমি কোন উত্তর দেই না। চুপ করে তখনো গানটা বিড়বিড় করছি।

রাতে খাবার সময় দাদা জিজ্ঞেস করলেন,

: তোর দাহেল ফরীক্কা হঁত্তে শ্যাষ অব? (তোর দাখিল পরীক্ষা কবে শেষ হবে?)

: এয়েদ্দে বছর মার্চত। (আগামী বছর মার্চে)

: অ এইচ্ছা। চিন্তা গইল্লাম দে, যেঞ্জারি অক তোরে লই যেয়ম দে আঁরা। (ও আচ্ছা। চিন্তা করলাম, যেভাবেই হোক, তোকে নিয়েই আমরা যাবো।)

আমি মোটেও ভাবি নি, দাদার এই আশাটা যে সত্যি হবে খুব তাড়াতাড়ি।

ছুটি শেষে ক্যাম্পাসে চলে আসলাম। আমার দু'আও থেমে নেই। এরই মধ্যে মেজো আব্বু একদিন ফোন করলেন আবূ নাঈম স্যারের সেলফোনে। বুঝলাম এই অসময়ে ফোন আসাটা দাদুর কারসাজিতেই হয়েছে। আমাকে অবাক করে দিয়ে এবং মোহাবিষ্ট করে বললেন সামনের ছুটিতে শিগগির পাসপোর্ট করে ফেলতে। আব্বুর সাথে কথা বলে মিষ্টি আব্বুকে সবকিছুর ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্যে বললেন। মেজো আব্বু খুব ভালোবাসতেন জানতাম। কিন্তু এত্তটুকু? এত্তবেশি? হয়তো আল্লাহর ইচ্ছা!

আমি তখন মাত্রাতিরিক্ত আনন্দে আত্মহারা। না, বেশি আবেগতাড়িত হওয়া যাবে না। সুস্থির হয়ে দু'রাকাত সালাত আদায় করলাম। এরই মধ্যে আমার পাগলামোর কাহিনী শুনে বড় ফুফু-ও অসাধারণ অনুপ্রাণিত হলেন, তাঁর সুপ্ত বাসনাটাও জেগে উঠলো হঠাৎ। এবং তিনিও অবশেষে আমাদের সাথী হতে মনস্থির করলেন। [মজার বিষয়, একইভাবে দুজন সহপাঠীও হঠাৎ করে আবেগতাড়িত হয়ে টাকা জমাতে শুরু করেছে, উরিব্বাস! আন্তরিক দু'আ করি, আল্লাহ তাদের ইচ্ছে কবুল করুন।]

গতবার রামাদানে আমাদের যাবার কথা ছিলো। আমরা আবেদন করবার আগ মুহূর্তে ভিসা দেওয়া বন্ধ। কিছুটা মন খারাপ হলেও খুব মর্মাহত হই নি, আল্লাহর ওপর ভরসা রেখেছি। আব্বু বললেন, রামাদানে যেহেতু জটিলতা দেখা যাচ্ছে, তার আগেই ব্যবস্থা হোক। যদিও আমার ই'তিকাফের স্বপ্নটা ভঙ্গ হবে, এই ভেবে মনে মনে খানিকটা বিষণ্ণ ছিলাম। এ সময় আবার দাদার অসুস্থতায় সেটাও হোল না। তবু তাওয়াক্কুল হারাই নি সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারীর ওপর।

ইদানীং বেশ কিছু লেখকের হাজ্জস্মৃতির নোট চোখে পড়ছে বারবার। এগুলো পড়ে পড়ে আরো উতলা হয়ে উঠছি আমি।

আলহামদুলিল্লাহ, অবশেষে আল্লাহ কবুল করেছেন। সবকিছু ঠিক থাকলে আমরা ইন শা-আল্লাহ জুমাবার রওনা দেবো।

গ.

এর মাঝে আরেকটি দুঃস্বপ্নের ঘানি এসে হাজির। খানিকটা বিষণ্ণতা অনুভব করছি; কারণ আমাকে সাথে নিয়ে 'উমরাহর স্বপ্ন দেখা দাদা আর দাদু দুজন-ই এবার

যেতে পারছেন না। দাদা হঠাৎ করে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তবু আমরা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছি। দাদু অনেকটাই অপ্রস্তুত এবং স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় হতচকিত। ভাবছিলাম আমি সান্ত্বনা দেবো, কিন্তু আমাকেই উল্টো সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তোমরাই যাও। হয়তো আল্লাহ এর মধ্যেই আমাদের কল্যাণ রেখেছেন।'

ঘ.

তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপযুক্ত কোনো ভাষা এই অধমের নেই প্রভু! মহাকালের ঊর্ণজালে জড়িয়ে আমি কতোভাবে কতোবার তোমাকে ভুলেছি, ভুলছি। অথচ! অথচ সেই তুমি একটিবারের জন্যেও বিরাগভাজন হও নি তোমার ক্ষুদ্র বান্দাটির উপর। আমার শতো ভুল আর অসঙ্গতির বিরক্তিকর রোদ তোমার রহমের ছায়ায় বিলীন করে দিয়েছো বারবার।

অবনত মস্তকে কেবলই বারবার বলতে ইচ্ছে করছে, আমার সবটুকু ভালোবাসা, ভালো লাগা এবং হৃদয়াবেগ তোমার জন্যে নিবেদিত হোক, হে দ্বীন দুনিয়ার মালিক!

স্বপ্ন যখন পৌঁছে গেলো মঞ্জিলে

অন্য আর দশজনের চে' আমার 'উমরাহ সফরের অভিজ্ঞতা ভিন্ন কিছু নয়। ভ্রমণকাহিনী অথবা সফর অভিজ্ঞতা আমার নিজের কাছেই খুব একটা আকর্ষণের বিষয় নয়। উপরন্তু এখানে 'রিয়া'জনিত ব্যাপারে সংকোচ থাকায় এ বিষয়ে লেখার ইচ্ছে পোষণ করি নি। কিন্তু তখন থেকেই ক'জন প্রিয় মানুষ উপর্যুপরি অনুরোধ জানাচ্ছিলেন কিছু লেখার জন্যে। আব্বুও যখন বলছিলেন স্বপ্নরঞ্জিন দিনগুলোকে একটু ধরে রাখার জন্যে, আল্লাহর ওপর ভরসা করে কলম হাতে দিচ্ছি। এটা মক্কায় অবস্থানের দিনগুলো নিয়ে।

দিনক্ষণের হিসেব খুব একটা ভালোভাবে মনে নেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে। সফরের প্রেক্ষাপট এর আগে একটি লেখায় লিখেছিলাম। আমরা রমাদানের দ্বাদশ দিনে বাঙলাদেশ থেকে রওনা হয়েছিলাম। আমরা ছিলাম পাঁচজন: বড় ফুফু, ছোট আম্মু, আমি, নাশিত ও সামিত। শাহ আমানত বিমান বন্দর থেকে রাত বারোটায় ফ্লাইট। দাদা তখন ন্যাশনাল হসপিটালে ভর্তি ছিলেন। আমরা প্রথমে ওখানে গিয়ে দাদার দু'আ নিয়ে আসলাম।[১]

বিমানবন্দরে এসে পৌঁছলাম রাত দশটায়। লাইনে দাঁড়িয়ে প্রথমে বিমানের টিকেট

---

১ দাদার দ্বিতীয়বার আল্লাহর ঘরে যাওয়ার স্বপ্ন আর পূরণ হোল না, পরের বছর চলে গেছেন আল্লাহর কাছেই। আল্লাহ আমার দাদাকে রহম করুন, ক্ষমা করুন, জান্নাতের মেহমান বানিয়ে সম্মানিত করুন।

সংগ্রহ করলাম। এরপর ইমিগ্রেশন। ইমিগ্রেশন অফিসার যথেষ্ট কড়া এবং তার চেহারা গোয়েন্দা-টাইপের। বিমানের কর্মকর্তার কাছে শুনলাম, বাংলাদেশ থেকে একটা উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক মানুষ 'উমরাহ ভিসা নিয়ে যান, কিন্তু সময় শেষ হলে আর আসেন না। ওখানে প্রত্যন্ত কোনো অঞ্চলে গিয়ে গোপনে জীবিকা নির্বাহ করেন। এ জন্যে ইমিগ্রেশনে যথেষ্ট কড়াতড়ি লক্ষ্য করলাম 'উমরাহ যাত্রীদের ক্ষেত্রে। ইমিগ্রেশন শেষ করতে করতে সাড়ে এগারোটার কাছাকাছি।

'ইশার সালাত আদায় করে ইহরামের কাপড় পড়ছিলাম। এই অনুভূতিটা একেবারে ভিন্ন। সম্পূর্ণ আলাদা। আমার মতো কাষ্ঠকঠিন হৃদয়ের মানুষও তখন কী জানি ভেবে কেঁদে ফেলেছি। দুই টুকরো সাদা কাপড়ে জড়ানো 'আমি'কে দেখে কেবলই মনে হচ্ছিলো অনন্তের পথে একজন অসহায় যাত্রী ছাড়া আমি আর কিছুই নই! দু রাকাত সালাত আদায় করেই বিমানে উঠে পড়ার ডাক। আমরা আরো অনেক 'বায়তুল্লাহর মুসাফির'দের সাথে আল্লাহর নামে উঠে পড়লাম।

মুখে তখন শুধুই তালবিয়া। আমাদের সিট দুই সারিতে মিলিয়ে। প্রথম সারির দুটোতে আমি আর নাশিত। দ্বিতীয় সারিতে ছোট আম্মু, ফুফু আর সামিত। আমার পাশেই কাকতালীয়ভাবে সহযাত্রী হিসেবে পেলাম পাশের এলাকার পরিচিত একজন আঙ্কেলকে। যেতে যেতে বললাম, 'আমরা কিন্তু হাজ্ব করতে যাচ্ছি!' বড় ফুফু ধরতে পারলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, রমাদানে 'উমরাহ করা তো হাজ্ব'র মতোই!' আমি বললাম, 'ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হোল, এই হাদিসের শেষে বলা হয়েছে, রমাদানে 'উমরাহ করা রাসূলুল্লাহ'র [ﷺ] সাথে হাজ্ব করার মতোই![১]' ফুফু, ছোট আম্মু সহ পাশের 'উমরাহ যাত্রীদের মুখেও একটা তৃপ্তি ও গর্বের হাসি। আর আমিও হাসিটা উপহার দিতে পেরে আনন্দিত।

সাহরীপর্ব বিমানেই সেরে নিলাম। সৌদি আরবের স্থানীয় সময় ভোর চারটায় আমরা ল্যান্ড করলাম কিং আবদুল আজিজ এয়ারপোর্টে। এখানে ফজরের সালাত আদায় করলাম। এরপর ইমিগ্রেশন শেষ করে এয়ারপোর্ট থেকে বের হতে হতে সূর্য পূর্বাকাশে উঁকি দিচ্ছে। মু'আল্লিমের গাড়ি আমাদের মক্কা আল-মুকাররমার উদ্দেশ্যে নিয়ে চললো। ছোট আব্বু, মেজো আব্বু, বড় ফুপা আর ছোটাচ্চুর উপর্যুপরি ফোন এদিকে। মক্কায় গিয়ে আমাদের একটি হোটেলে নিয়ে যাওয়া হোল। কথা ছিলো, মক্কায় এসে ছোট আব্বু আমাদের রিসিভ করবেন। কোনো কারণে মাদীনাহ থেকে

১ সাহীহ আল-বুখারী: ১৭৩০

রওনা হতে বিলম্ব হওয়ায় এখানে দেরিতে পৌঁছতে হোল তাকে। তখন বারোটার কাঁটা ছুঁই ছুঁই। আমরা এখান থেকে বায়তুল্লাহর কাছাকাছি আরেকটি হোটেলে চলে এলাম যোহরের আগেই। ততক্ষণে বড় ফুফাও এসে হাজির। মাদীনাহ থেকে মেজো আব্বু, মেজো আম্মুর অনবরত ফোন আর উৎকণ্ঠা। অল্প কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে সবাই মিলে ছুটলাম বায়তুল্লাহর দিকে, উদ্দেশ্য যোহরের জামা'আতে শরিক হওয়া।

সামিতকে আমি কাঁধে তুলে ফেলেছি, আর নাশিতকে বড় ফুফা। ফুফু, ছোট আম্মু আর ছোট আব্বু আমাদের পেছন পেছন হাঁটছেন। উহুঁ! এই হাঁটা যেনো শেষ হতে চায় না কোনভাবেই! দীর্ঘ সফরে আমি খুবই ক্লান্তি অনুভব করছিলাম। তার ওপর এই গনগনে রৌদ্রে হাঁটা! তবুও, তবুও... এ যে প্রিয়তম মালিকের ঘরের উদ্দেশ্যে হাঁটা! এ যে আজন্ম লালিত স্বপ্নের বায়তুল্লাহকে দর্শনের জন্যে হাঁটা! এ যে প্রিয়তম প্রভুর সান্নিধ্য লাভের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে হাঁটা! কিসের ক্লান্তি? কিসের অবসাদ? ভালো লাগা ও ভালোবাসার মিশ্র এক পবিত্র অনুভূতিতে ততক্ষণে চেহারায় জমে ওঠা ঘামের বিন্দুগুলোর সাথে দু ফোঁটা অশ্রু-ও মিশে গেছে।

আমরা হারামের কাছাকাছি পৌঁছুতেই ইক্বামাত শুনতে পেলাম। মাসজিদ আল-হারামের বাইরের অংশে ততক্ষণে সবাই কাতারবন্দী হয়েছেন। আমরাও ওখানে দাঁড়িয়ে গেলাম। আহ! এতো দীর্ঘ সময় নিয়ে রুকূ' এবং সাজদা! খুশূ' আর খুদূ'র অনিবার্য উপস্থিতি সালাতের প্রতিটি পর্বেই! সে আরেক অনন্য অনুভব! এই সালাতের তৃপ্তি আর স্বাদ একেবারে ভিন্ন। আমার এদিকে তর সইছে না একেবারেই। যোহরের সালাত শেষ করে প্রতীক্ষিত বায়তুল্লাহ দর্শনের জন্যে ব্যাকুলতা বেড়ে গেলো। ছোট আব্বু আর ফুফাকে অনুসরণ করে আমরা ধীর পদক্ষেপে হাঁটছি। 'বাব ইসমা'ঈল' দিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম হারামের অভ্যন্তরে। একটু হেঁটেই ডানে মোড় নিয়ে যেই না ধীরে ধীরে কালো গিলাফের ছবিটা স্পষ্ট হতে শুরু করেছে, আবেগ-উচ্ছ্বাস এবং প্রিয়তম প্রভুর প্রতি বিনয়াবনত কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা হৃদয়ে দোলা দিতে শুরু করলো। আহ! এ আমার প্রিয় বায়তুল্লাহ! এ আমার স্বপ্নের বায়তুল্লাহ! এ আমার চির আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসার কা'বা!

কা'বার চত্বরে কিছুক্ষণ বসলাম আমরা। মাথার উপর তখন দুপুরের সূর্যের প্রখর তাপ। তবুও রহমতের ঝরনাধারা এখানে অদৃশ্য কোনো প্রশান্তির আবেশে জড়িয়ে নিচ্ছে সব আল্লাহপ্রেমিককেই। এবার তাওয়াফের পালা। ছোট আব্বু সামিতকে নিয়ে ছোট আম্মু আর ফুফুর সাথে। আমি নাশিতকে নিয়ে শুরু করলাম। প্রথম চক্করেই

তাঁদের চে' আমরা অনেক এগিয়ে গেলাম। দ্বিতীয় চক্করে হারিয়েই ফেললাম। তবে তাওয়াফ শুরুর পূর্বেই ছোট আব্বু বলেছিলেন, শেষ করে কিং সাউদ গেইটে সবাই মিলিত হবো। তাই আমি নাশিতকে সাথে নিয়ে আমার মতোই তাওয়াফে মনোযোগী হলাম। সাদা আর কালো এখানে একাকার। নেককার আর পাপী এখানে একাকার। সব ভাষা, সব জাতি এখানে একাকার। সবার মুখেই এক আল্লাহর প্রশংসা, এক আল্লাহর তালবিয়া, এক আল্লাহর কাছেই হৃদয়ের সব আকুতি। কাতর কণ্ঠে এখানে কতো মানুষকে দেখেছি শ্রাবণের বারিধারার মতো অশ্রু বিসর্জন দিতে। যত পাষাণ হৃদয়-ই হোক, এ দৃশ্য দেখেও তো অন্তত তাঁর চোখ চিকচিক করে ওঠবে।

তাওয়াফের সময় খেয়াল করলাম, পিচ্চি-পাচ্চাদের দেখলে সবাই একটুখানি হেসে হাঁটতে হাঁটতেই হয় গাল টেনে দিচ্ছে, নয় মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তীব্র গরম থাকায় এখানে তাওয়াফ করতে করতেই অনেকে ঠান্ডা পানি ছিটিয়ে দিচ্ছেন সবার চোখেমুখে অথবা মাথায়। এ রকম একজন গোটা তিনেক আঁজলা পানি নাশিতের মাথায় ঢেলে দিলো। ও কিছু বুঝতে না পেরে ভ্যাঁ করে কেঁদে দিলো। অনেকেই 'টেইক অফ টেইক অফ প্লিজ' বলে অনুচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগলেন। আমি পড়ে গেলাম মহাবিপদে। আল্লাহকে ডাকছিলাম আর বলছিলাম, আল্লাহ ওর কান্না থামিয়ে দাও প্লিজ! আলহামদুলিল্লাহ, একটু পরেই ও নিজ থেকেই কান্না থামিয়ে দিলো। অতঃপর দুই ভাই মিলে সাত চক্কর তাওয়াফ শেষ করলাম এবং মাকামে ইবরাহীমের কাছেই দু রাকাত সালাত আদায় করে বাকীদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তাঁদের সময় একটু বেশি-ই লাগলো।

তাওয়াফ শেষ হতে হতে আসরের আযান হয়ে গেলো। আমরা বায়তুল্লাহর একেবারে কাছেই সালাত আদায় করে নিলাম। এরপর কা'বার চত্ত্বরেই সবাই মিলে বসলাম। ছোট আব্বু বললেন, ইফতার ও মাগরিব সেরেই সা'য়ী করবেন। ইফতার পর্যন্ত এখানেই কুরআন তিলাওয়াত করলাম। বায়তুল্লাহর দিকে যতবার মুখ তুলে তাকাই, ততবার চোখটা ভিজে ওঠে। আমি কি যেনো বলতে গিয়ে আর বলতে পারি না। অভিযোগ আর চাওয়ার ঢেউ এসে বুকের ভেতরেই আবার হারিয়ে যায়। বললাম, 'আল্লাহ, হৃদয়ের সবগুলো অব্যক্ত অনুভূতিই তুমি জানো। তুমি আমার কাছ থেকে কবূল করে নাও।' দেশে কতজন যে নাম ধরে দু'আ করতে বলেছিলেন! আল্লাহর রাসূল [ﷺ] নিজেও 'উমার [রা.]-এর কাছে দু'আ চেয়েছিলেন, যখন তিনি

'উমরাহর জন্যে রওনা হবার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহর অনুমতি নিতে গিয়েছিলেন।[১] আমি একে একে সবার নামই স্মরণ করতে চেষ্টা করলাম। ইফতারের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আকণ্ঠ তৃষ্ণা আমার। জমজমের শীতল পানি গলায় পড়তেই শুকনো বুকে এক পশলা প্রশান্তির বৃষ্টি ঝরে গেলো। মাগরিবের সালাত পড়ালেন প্রিয় মানুষ শাইখ আস-সুদাইস। এই অসাধারণ মানুষটির তিলাওয়াত শুনে কতোবার আবেগতাড়িত হয়েছিলাম! আর আজকে সরাসরি তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে, তাঁর কণ্ঠে তিলাওয়াত শুনে বায়তুল্লাহতে সালাত আদায় করছি– এ ভাগ্য ক জনের হয়? আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় হৃদয়-মন বিগলিত হয়ে যায় এমনিতেই।

মাগরিবের পর আমরা সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করলাম। সা'য়ী শেষে চুল পুরো ফেলে দেওয়া (হালাক) অথবা কমিয়ে ফেলা (কাসর) — দুটোর একটি করতে হয়। মহিলাদের জন্যে দ্বিতীয়টি। ততক্ষণে ইশার আযান হয়ে গেছে, এ জন্যে আমি আর বাইরে আসতে পারলাম না। ওখানে লক্ষ করলাম, সা'য়ী শেষ করে কিছু মহিলা এক জায়গায় বসে আছেন। তাঁরা ফুফু আর ছোট আম্মুকে ডেকে তাঁদের সাথে থাকা ছোট একটা কাঁচি দিয়ে হিজাবের ভেতরেই একগুচ্ছ চুল কেটে নিয়ে এলেন। আমরা তারাওয়ীহ এবং ওয়িত্র শেষ করে হোটেলে ফিরলাম। রুমে প্রবেশের আগেই আমি পাশের সেলুনে গিয়ে চুল হালাক করলাম। ফুফা আর ছোট আব্বু ফলমূল, দুধ, জুস আর নানা খাবার জমিয়েও ক্ষান্ত হচ্ছেন না। জোর করে খাওয়াবেনই। একটু চোখ বুঁজে আসতেই ঘনিয়ে এলো সাহরীর সময়। আমরা হোটেলে সাহরী সেরে নিলাম।

ফাজরের সালাতে আমি আর ছোট আব্বু শরিক হলাম বায়তুল্লাহতেই। সালাত শেষে আমি কা'বা চত্বরেই রয়ে গেলাম, ছোট আব্বু দুপুরের আগে করে ছোট আম্মু আর ফুফুকে নিয়ে এলেন। ইশা ও তারাওয়ীহ'র পরে তাঁরা চলে গেলেন, আমাকে বহু অনুরোধ করলেন, কিন্তু কোনোভাবেই গেলাম না। কা'বা চত্বরে তখন আস্তে আস্তে ভীড় কমতে শুরু করে। কখন যে এতো বেশি ভালোবেসে ফেলেছি প্রিয় বায়তুল্লাহকে, বুঝতে পারি নি। এখানে আল্লাহর সাথে কথা বলা শেষ করে সাহরীর একটু আগে হোটেলে উপস্থিত হলাম। আবার ভোরেই বায়তুল্লাহ'র দিকে হাঁটা দেওয়া। মোটামুটি মক্কায় অবস্থানের দিনগুলোতে এটাই ছিলো আমার দৈনন্দিন

---

১ 'উমার [রা.] থেকে বর্ণিত। তিনি যখন 'উমরাহর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর [ﷺ] অনুমতি নিতে গিয়েছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: اي أخي أشركنا في دعائك ولا تنسنا "আমার ভাই! তোমার দু'আয় আমাদেরকে শরিক করবে, আমাদের কথা ভুলবে না।" [সুনান আত-তিরমিযী: ৩৫৬২] هذا حديث حسن صحيح

রুটিন। মাঝে একবার ছোট আব্বু বললেন মক্কার ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো ঘুরে আসার। আমরা একটি গাড়ি ভাড়া করে সাওর গুহা (যেখানে হিজরতের সময় প্রিয় নবীজি [ﷺ] ও আবূ বাকর [রা.] অবস্থান নিয়েছিলেন), আরাফাত ময়দান, মাসজিদে নামিরাহ, জাবালে রাহমাত, মিনা ও মুজদালিফাহ, হেরা গুহা সহ আরো কিছু জায়গা ঘুরে এলাম।

হেরা গুহায় উঠার অনেক শখ জাগলো আমার, কিন্তু সবাই ভয় দেখালেন এই বলে যে এখানে উঠতে তিন ঘণ্টা লাগবে। কী আশ্চর্য! পাহাড়টা আমার অত বেশি উঁচুও মনে হচ্ছিলো না; তিন ঘণ্টা লাগবে কেনো? মেজো আম্মু আর ছোটাচ্চুও ফোন করে অভয় দিলেন, তুমি পারবা। হোটেলে ফিরেই বায়না ধরলাম, আমাকে যে করেই হোক হেরা গুহায় উঠা চাই। শেষমেশ ফুফা রাজি হলেন। অসুস্থ শরীর নিয়ে ফুফুরও ইচ্ছে হোল আমাদের সাথে শরিক হবার। আমরা তিনজন একটি গাড়ি ভাড়া করে চলে এলাম জাবালুন নূরের পাদদেশে। সময়টা দুপুরের পর। প্রখর রৌদ্র মাথার উপরে। তার ওপর রমাদানের দিন, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর। ফুফা বললেন, এখানে তিনি বারো বছর থেকেও কোনদিন হেরা গুহায় যাবার সাহস করেন নি। আমাকে শেষবারের মতন ভেবে দেখতে বললেন। আমি নাছোড়বান্দা।

ফুফু-ফুফাকে বিদায় দিয়ে আল্লাহর নামে চড়া শুরু করলাম। মাঝপথে ইয়েমেনের একজন ভাইয়াকে পেলাম। তাঁর সাথে গল্প করতে করতে কতদূর গিয়েছি, এমন সময় হাঁপিয়ে উঠলাম। আধঘন্টা পার হয়েছে ততক্ষণে, কিন্তু পাহাড়ের চূড়া অনেক দূরে বোঝা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ এক জায়গায় বিশ্রাম নিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আমাকেও উঠার জন্যে বললেন, কিন্তু আমার অবস্থা সঙ্গিন। আর পারছিলাম না। উনিও আমাকে ছাড়া যাবেন না। বাধ্য হয়ে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁকে বললাম, আপনি চলুন, আমিও একটু পরে আসছি ইন শা-আল্লাহ। উনি পেছন ফিরে ফিরে হাঁটা শুরু করলেন। আহা, ভ্রাতৃত্ববোধ! মমত্ববোধ! এই অকৃত্রিম ভালোবাসার উৎস কোথায়? এই নিখাদ-নিঃস্বার্থ আন্তরিকতার শেকড় কোন্ গভীরে প্রোথিত, মানুষ তুমি জানো? জানার চেষ্টা করো?

আর কিছুক্ষণের মধ্যে দেখলাম আরেকজন ভাইয়া আসছেন। কাঁধে ট্রাভেলার ব্যাগ। বেশ সুঠাম দেহ। এসেই আমার পাশে বসলেন। পরিচয় পর্ব সেরে নিলাম। উনি পাঞ্জাব থেকে এসেছেন। আরবি ও ইংরেজি দুটোই ভালো পারেন। ব্যাগ থেকে একে একে তিন বোতল পানি বের করে আমার মাথা ভেজালেন, অযু করালেন, তারপর

আবার মাথায় পানি ঢেলে নিজেও এক বোতল মাথায় ঢাললেন। তারপর আমার হাতে আরো দুই বোতল পানি ধরিয়ে দিলেন এবং আমাকে সাথে নিয়ে হাঁটা শুরু করলেন। ব্যাগে অন্তত আরো ছয়-সাত বোতল পানি আছে তাঁর, বোঝা যাচ্ছে। আমি হাঁটতে হাঁটতে তাঁর জন্যে সেই দু'আটি করলাম, যেই দু'আ আল-মুবাররাদ করেছিলেন: بَرَّدَ الله من بَرَّدَنِي

বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ এবং আন্তরিক আচরণ তাঁর। নানা গল্প করতে করতে দু জন মিলে প্রায় কাছাকাছি চলে আসলাম। ততক্ষণে এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। আবার খানিক জিরিয়ে নিয়ে আমরা শুরু করলাম। পথে কিছু বানরের দেখা পেলাম, ওদেরকে একটা বোতল ছুঁড়ে দিতেই মহা আনন্দে পানি খেতে লাগলো আর আমাদের পথ ছেড়ে দিলো।আল্লাহর সৃষ্টিবৈচিত্র্যের নিদর্শন এই বানরগুলো। তরুপল্লবহীন পাথুরে পাহাড়গুলোতে কী নিশ্চিন্তে দিনাতিপাত করে যাচ্ছে তারা! দু জনে ক্লান্তি ভুলতে কথার তুবড়ি ছুটিয়ে চলছি। কথা প্রসঙ্গো আমাকে জিজ্ঞেস করলেন রাসূলুল্লাহ [ﷺ] মানুষ কি-না। আমি তাঁকে একটি আরবি কবিতার শ্লোক শুনিয়ে দিলাম:

محمد بشر وليس كالبشر * بل هو ياقوط والناس كالحجر

[মুহাম্মাদ [ﷺ] মানুষ ছিলেন, কিন্তু যেনতেন মানুষ নন। বরং (এটার উদাহরণ হোল,) মানুষেরা সবাই পাথর, কিন্তু তিনি ছিলেন পরশ পাথর!]

তাঁর বেশ পছন্দ হোল কবিতাটা। আরো কয়েকবার বলতে বললেন, যেন মুখস্থ হয়ে যায়। এক ঘণ্টা পঁচিশ মিনিটের মাথায় আমরা চূড়ায় এসে পৌঁছলাম। ভাবতে অবাক লাগছিলো, ওয়াহি নাযিলের আগে রাসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন এখানে অবস্থান করতেন, তখন খাদীযাহ [রা.] নিয়মিত-ই এই সুদীর্ঘ ঢালু পাহাড়ী পথ বেয়ে উঠতেন-নামতেন এবং রাসূলুল্লাহর [ﷺ] জন্যে খাবার নিয়ে যেতেন। একজন নারী কতটুকু অকৃত্রিম ভালোবাসা অন্তরে লালন করলে এই ক্লেশাবহ পরিশ্রমের অগ্নিমুখে স্বচ্ছন্দ আনন্দের গোলাপ ফোটাতে পারেন, ভাবা যায়?

এসব ভাবতে ভাবতে চূড়ায় উঠতে পারার সগৌরব হাসি অস্তিত্বের জানান দিতে শুরু করেছে আমার ঘর্মাক্ত মুখাবয়বে। আলহামদুলিল্লাহ! এমন আনন্দ আর সাফল্যের গর্ব ইতোপূর্বে কখনোই অনুভূত হয় নি! হাজ্ব বা 'উমরাহর সাথে এর কোন সম্পৃক্ততা নেই, কিংবা এখানে এলে বিশেষ কোনো পুণ্যলাভের কথা-ও কুরআন বা সুন্নাহতে নেই। কিন্তু প্রিয় নবীজির [ﷺ] প্রতি ভালোবাসা আর প্রথম ওয়াহি অবতীর্ণ হবার স্থানটুকু এক নজরে দেখার ঔৎসুক্য থেকে এখানে অনেকে

প্রচন্ড কষ্ট স্বীকার করেও চলে আসেন। দু জন মিলে চূড়ায় উঠে খোঁজাখুঁজি শুরু করলাম। কিন্তু কোথায় সেই গুহা? ইতিউতি তাকাতে একজন বৃদ্ধ আসলেন। চূড়ায় ছোট্ট একটা বিশ্রামাগার আর কুলিং কর্নারের মত করে একটা দোকান দিয়েছেন দু জনে মিলে। তিনি জানালেন, অন্য পাশ দিয়ে আরেকটু নিচে নামতে হবে। পথটা নিজেই দেখিয়ে দিলেন। আমরা আরেকটু নেমে অবশেষে গুহায় এসে পৌঁছলাম। এই সেই স্থান, যেখানে কুরআনের প্রথম বাণী নাযিল হয়েছিলো! এই সেই গুহা, যেখানে প্রিয় নবীজির [ﷺ] সময় কাটতো! আমি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখন! সুবহানাল্লাহ! ততক্ষণে আসরের আযান হয়েছে। ভাইয়া আর আমি মিলে গুহার অভ্যন্তরেই আসরের সালাত জামা'আতে আদায় করলাম। আমাদের সাথে একজন ইন্দোনেশিয়ান তরুণ-ও যোগ দিলেন। আমরা আর কিছুক্ষণ বসে নেমে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছি, এমন সময় ফুফা ফোন দিয়ে বললেন, 'আমিও অর্ধেক চলে এসেছি! তুমি নেমো না।' বাব্বাহ! এতো ভীরু মানুষ হঠাৎ এমন সাহসী হলেন কিভাবে! যাই হোক, আমি কিছুদূর নামলাম তাঁকে স্বাগত জানাতে। আধঘণ্টার ব্যবধানে দু জনে একত্রিত হলাম। ততক্ষণে ফুফা হাঁপিয়ে উঠেছেন! দু জনে মিলে আবার উঠা শুরু। আমার যে কী অবস্থা তখন চলে যাচ্ছে, নিজেও টের পাই নি। ফুফা নিজ থেকেই বলছেন, 'ভাবলাম এই বয়সে আমাদের আব্বুটা আব্বুটা সাহস করে উঠে গেলো! আমি অভাগা ক্যান পারবো না?'

আমরা নামতে নামতে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে। দ্রুত গাড়ি নিয়ে সোজা চলে এলাম বায়তুল্লাহতেই। এখানে ইফতার, মাগরিব, ইশা ও তারাওয়ীহ সেরে হোটেলে চলে এলাম।

মক্কায় অবস্থানের মেয়াদ শেষ হয়ে এলো আমাদের। এখানের শেষ তারাওয়ীহর তিলাওয়াতগুলো বড়ো বেশি মায়াবী মনে হচ্ছিলো। বারবার আবেগসিক্ত বিরহ-ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ছিলাম। আহ! আবার কখন কুরআনের যাদুকরী এই সুর-লহরী, এই অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় তিলাওয়াত উপভোগ করে করে প্রিয় বায়তুল্লাহকে সামনে রেখে প্রিয়তম মালিকের প্রতি সিজদাবনত হতে পারবো? ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গন্ডদেশ বেয়ে পড়ে কাবার চত্বরে মিশে যাবার দৃশ্য দেখার এ অপার্থিব আনন্দ আর সুখানুভূতি থেকে তবে কি আমি বঞ্চিত হতে চলছি?

স্বপ্নের উড়াউড়ি, স্বপ্নের অবশেষ

মেজো আব্বু, মেজো আম্মু আর ছোটাচ্চুর অপেক্ষার প্রহর কাটছিলো না মাদীনাহতে। উপর্যুপরি ফোন তাঁদের। আমাদের পরিকল্পনা ছিলো মাসজিদ নাবাওয়িতে ই'তিকাফের। এ জন্যে রমাদানের অষ্টাদশ দিবসে মাদীনাহতে মেজো আব্বুর বাসায় চলে এলাম। সুহাইমা আর সাহিম এই প্রথম তাদের বড়ো ভাইয়াকে দেখলো। ওরা সারাটি ক্ষণ কোনোভাবেই তাই আমার পাশ থেকে নড়তে চায় না। কী এক মায়ার জালে আটকে গেলাম সামান্য কিছুক্ষণেই! ও হ্যাঁ, বলাই হয় নি, আমাদের মক্কায় অবস্থানের দ্বিতীয় দিনেই মেজো আম্মুর কোলজুড়ে আল্লাহ আরেকজন মেহমান পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাদের সেই ভাইটার নাম রাখার দায়িত্ব পড়লো আমার উপরেই।

সন্ধ্যার পর ফুফা উহুদ পাহাড় ও প্রান্তর, শহীদদের কবর, মাসজিদে কুবা আর অন্যান্য বিখ্যাত জায়গাগুলো ঘুরিয়ে আনলেন। ঐদিন তারাওয়ীহ আদায় করলাম মাসজিদে কুবাতেই। হিজরতের পর প্রিয় নবীজি [ﷺ] এখানে প্রথম জুমু'আহ আদায় করেছিলেন এবং ঐতিহাসিক খুতবাটি দিয়েছিলেন। ওয়িতরের মুনাজাতে সম্মানিত ইমাম ফিলিস্তিনের মজলুমদের জন্যে কান্নাজড়িত কণ্ঠে যখন আল্লাহর দরবারে আর্তনাদ করে উঠলেন, পুরো মাসজিদেই কান্নার রোল পড়ে গেলো।

মাসজিদ নাবাওয়ি মেজো আব্বুর বাসা থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। পরদিন জুমু'আহর সালাত ওখানেই আদায় করলাম। হার্টবিট বেড়ে চলছিলো। সবুজ গম্বুজ কই? এখনো চোখে পড়ছে না কেনো? ক্রমে ক্রমে চোখের সামনে স্পষ্ট

হতে লাগলো। আহ! প্রিয় নবীজি [ﷺ] আমার! আমার প্রেরণা ও ভালোবাসার রাসূল এখানেই তো অন্তিম শয্যায়! মুখে আর বুকে কেবলই 'সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম'-এর অনুরণন। রাসূলপ্রেমের ঢেউ ছলকে উঠছিলো ভাবাবেগের সাগরে। পকেট থেকে বের করি দেশ থেকে লিখে নিয়ে আসা কবিতার কাগজ। সত্তর দশকের অত্যুজ্জ্বল কবিপ্রতিভা ও কাব্যতাত্ত্বিক আবিদ আজাদ-এর 'আমার রাসূল' কবিতাটা আমার ভীষণ প্রিয়। 'উমরাহর সময় ঝোঁক চাপলে আবৃত্তি করার সুবিধার্থে পকেটে রাখা কবিতাগুলোর মধ্যে এটিও ছিলো। সবুজ গম্বুজের পাশে এসে মনে হোল, এই কবিতাটা মনভরে আবৃত্তির এই বুঝি উপযুক্ত সময়!

"আমাকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে মিশিয়ে দিলে না কেন আমার রাসূলের রোজার খেজুরে?
কেন দাঁড় করিয়ে রাখলে না আমাকে সেই কিশোর রাখালের ক্লান্তি ও
স্বপ্নের পাশে মরূদ্যানের দিক থেকে ছুটে আসা হাওয়ার মতো?
তাঁর উদয় ও অস্তের সকল মেষ ও ভেড়ার ভিতর দিয়ে বয়ে যেতাম
আমি উট ও কাফেলার ঘণ্টাধ্বনি হয়ে তাঁবুর বিয়াবানে।
আরবের বুকের তাপ, জ্বর ও যন্ত্রণা শুষে নেওয়ার জন্যে আমাকেই
পাঠালে না কেন ভোর ও মেঘের হাওদায়?..."[১]

মন ভরলো না। কবি সাহাবি হাসসান ইবন সাবিত [রা.]-এর লেখা রাসূলুল্লাহকে [ﷺ] নিবেদিত এলিজি'র[২] আমার করা কাব্যানুবাদ[৩] থেকে কদ্দূর আবৃত্তি করে গেলাম। খুব ক্লান্ত ছিলাম। বসে পড়লাম। বসে বসেই বিড়বিড় করে আবৃত্তি করে গেলাম। নীরবে অশ্রুপাত হোল।

জুমু'আহর সালাতের পর ছোট আব্বু আর ছোটাচ্চু[৪] মিলে আমাকে প্রতীক্ষিত সেই

---

১ হাজার বছরের বাংলা কবিতা, পৃ. ১০১

২ পূর্ণ এলিজি কবিতার জন্যে দ্রষ্টব্য: সীরাত ইবন কাসীর খ. ৪ পৃ. ৫৫৬; সীরাত ইবন হিশাম, খ. ২ পৃ. ৬৬৬

৩ 'এক মুঠো সবুজের স্বপ্ন'তে এই কাব্যানুবাদ গ্রন্থাশ্রিত হয়েছে।

৪ ছোট আব্বু ও ছোটাচ্চু— এই দুই শব্দের ব্যাখ্যা দেই। চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাচাদের আব্বু সম্বোধনের রেওয়াজ আছে। আব্বুরা ছয় ভাই। তো, আমরা যথাক্রমে (আমার) আব্বু (অন্যদের কাছে 'বড়ো আব্বু'), মেজো আব্বু, সেজো আব্বু, ছোট আব্বু- এভাবে নামকরণ করতে গিয়ে দু জন বাদ পড়ে গেলেন, এদিকে ধারাক্রম-বিশেষণ শেষ হয়ে গেছে। একজনকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী 'মিষ্টি আব্বু' নামকরণ করা হোল। অন্যজনকে কী ডাকা যায়? মেজো আম্মুর পরামর্শ মোতাবেক আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, বিশেষণ যেহেতু পাওয়া যাচ্ছে না, বিশেষ্যকেই পরিবর্তন করা হোক; একদম ছোটোজনকে 'আব্বু' না ডেকে 'ছোট চাচ্চু'

রাসূলের মাসজিদে ই'তিকাফের জন্যে জায়গা নিতে নিয়ে এলেন। বেশ সৌহার্দপূর্ণ একটি জায়গায় স্থান পেলাম। এখানে আরেক হৃদয়বিদারক অনুভূতি! ভাবা যায়! আমি এখন এমন এক জায়গায় এসে থিতু হয়েছি, যেটা একাধারে প্রিয় নবীজির মাসজিদ, প্রিয় নবীজির বিচারালয়, প্রিয় নবীজির শিক্ষালয়, প্রিয় নবীজির প্রশাসনিক দফতর ﷺ একের ভেতরে সব! আমি সেই 'মাসজিদ নাবাওয়ী'তে অবস্থান করছি! আহ! সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

মাসজিদ নাবাওয়িতে অবস্থানের রুটিনটা মোটামুটি এ রকমই ছিলো — যোহরের সালাতের পর মাসজিদ লাইব্রেরিতে অধ্যয়ন। আসরের পর থেকে মাগরিব এবং মাগরিব থেকে 'ইশা আল-কুরআন হিফজ করা। তারাওয়ীহ এবং ওয়িতর শেষ হবার দু এক ঘণ্টার মধ্যেই আবার ক্বিয়ামুল্লাইল। এ জন্যে ঘুমানোর সুযোগ নেই কারো। ততক্ষণ ব্যক্তিগত 'ইবাদাত, সালাত আর তিলাওয়াতে মগ্ন সবাই। সাহরী শেষ করেই ফাজরের সালাত। তারপর সালাতুশ শুরুকের জন্যে অপেক্ষা। সালাতুশ শুরুক্ব সারা হতেই মাসজিদের সব লাইট অফ হয়ে যেতো। সবাই ঘুমাতেন। কেউ এগারোটা, কেউ বারোটা পর্যন্ত। আবার অনেকে দু এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে বাহির থেকে আলো আসতেই আল-কুরআন হাতে নিয়ে বসে যেতেন। নয়টা বা দশটার দিকে 'রাওদ্বাহ'তে[১] ভীড় কম থাকতো। আমি সুযোগ পেলে সে সময় প্রিয় নবীজিকে [ﷺ] সালাম দিয়ে আসতাম।

লাইব্রেরিতে বেশ জ্ঞানপিপাসু কিছু তরুণের সাথে পরিচিত হলাম, অনুভূতি বিনিময়ে সুযোগ পেলাম। এরমধ্যে আমার চে' বয়সে ছোট একজন মিশরীয় কিশোরের দেখা পেলাম। ও আবার বড় হয়েছে সৌদি আরবে। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি জানো 'Egypt' শব্দটা কোথা থেকে এসেছে? একটু অবাক হোল। আমি যখন বললাম, এটার উৎপত্তি 'أقباط' শব্দ থেকে; ও বেশ চমৎকৃত হোল এবং একটা ধন্যবাদ দিয়ে হাত টেনে নিয়ে চুমু খেল। লাইব্রেরিতে সে নিয়মিত-ই আসে, এ কারণে বই খোঁজার ক্ষেত্রে আমাকে বেগ পেতে হয় নি; সে-ই খুঁজে দিতো। মাসজিদের মধ্যে

বলা যেতে পারে। সেই 'ছোট চাচ্চু'র নজীবিয় সংস্করণ হচ্ছে 'ছোটাচ্চু'। আশা করি, পাঠকের সংশয় দূরীভূত হয়েছে।

১ অনেকেই 'রাওদ্বাহ'(/রওযা) বলতে রাসূলুল্লাহর [ﷺ] কবর-কে মনে করেন। অথচ, কবর ও রাওদ্বাহ দুটো ভিন্ন। এক্ষেত্রে আমরা রাসূলুল্লাহর বক্তব্যটি খেয়াল করতে পারি: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة "আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান (রাওদ্বাহ)।" [সাহীহ আল-বুখারী: ১১৩৭, সাহীহ মুসলিম: ৩৪৩৪।]

অনেকবার অনুচ্চ কিন্তু রাগত সুরে একজন আরেকজনের প্রতি সামান্য অজুহাতে অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছে— এ রকম যতজনকে দেখেছি, ছোটাচ্চু বললেন এরা মিশরীয়। সেখান থেকে আমার একটা ধারণা হয়েছে যে, মিশরীয় মানেই ঝগড়াটে ও রগচটা। কিন্তু এই ছেলেটাকে দেখার পরে কেউ-ই বিশ্বাস করতে চাইবে না, ঝগড়াটে লোকগুলো মিশরীয়। আসলে কিছু সংখ্যক মানুষকে দিয়ে একটি জাতি বা জাতিসত্তার স্বরূপ বা প্রকৃতি বিচার করা বোকামী।

ই'তিকাফের সময়টাতে বেশ কিছু আলোকিত মানুষের সাথে পরিচিত হয়েছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন তুরস্কের একজন আঙ্কেল, যিনি এখনো ভোলেন নি আমাকে। নাম তাঁর ইহসান কেররাহ। প্রথমদিনের পরিচয় থেকেই ইনি দেখা হলেই কপালে একটা চুমু খেতেন আর দু'আ করতেন এবং দু'আ চাইতেন। পাশে এসে একাধিকবার বলেছেন, 'তোমাকে সারাক্ষণ পড়তে দেখে ভালো লাগে বাবা!' আমার সমবয়সী তাঁর ছেলেও আমাদের সাথে ই'তিকাফে ছিলো। হাসিমুখ আর প্রাণোচ্ছল। সারাক্ষণ কাকে কুরআন এগিয়ে দেবে, ইফতার আর সাহরীতে কাকে একটু পানি পান করাবে, এই নিয়ে তার সারাক্ষণ উৎকণ্ঠা। কিন্তু প্রথমবারেই যখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, আমি কুরআনের হাফিজ কি-না; আর আমি 'না' উত্তর দেওয়ায় সে বলেছিলো 'জা'আলাকাল্লাহু মিন হুফফাজিল কুরআন' (আল্লাহ তোমাকে কুরআনের হাফিজদের অন্তর্ভূক্ত করুন); তখন নিজের ওপর শক্ত অভিমান হচ্ছিলো। এখনো আল্লাহর কাছে বারবার চাই, যেনো তার দু'আটা কবুল হয়। সপ্তদশ রমাদানেই তিনি তুরস্কে ফিরে যান। যাবার সময় সাথে আনা দুটো বইও আমাকে গিফট করে যান। আমি যে জায়গায় অবস্থান নিচ্ছিলাম, সেখান থেকে তুলে এনে তাঁর জায়গায় আমার বালিশ আর ব্যাগটা নিয়ে এলেন। বললেন, 'ওদিকে ঘুমাবার সময় তোমার মাথায় সামনের সারি থেকে এই ভাইটার পা লেগে যায়, তুমি এখন থেকে আমার জায়গাতেই থাকলে খুশি হবো।' তাঁর দেখাদেখি আরেকজন ইয়ামেনী আঙ্কেলও একগুচ্ছ বই গিফট করলেন। কী আশ্চর্য! ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে! আর আমি বইপাগলাকে আল্লাহ কোথাও নিরাশ করেন না, বুঝছি!

এরই মাঝে পরিচিত হলাম দু জন সৌদি নাগরিকের সাথে। এই দুই ভাইয়া পরস্পর বন্ধু, দু জনেই প্রকৌশলী। ইয়ানবূ'র অধিবাসী; প্রতি বছরই মাসজিদ নাবাওয়িতে তাঁরা মু'তাকিফ হন। চমৎকার এবং অসাধারণ তাঁদের ব্যবহার। ব্যক্তিগত তাক্বওয়া'র ব্যাপারে যথেষ্ট যত্নশীল। আমি কুরআন পড়তে গিয়ে একটি অপরিচিত শব্দ পেয়ে তাঁদের একজনকে (নাম তাঁর 'আয়াদ') অনুরোধ করেছিলাম এটার সমার্থক ইংরেজি

শব্দ জানাতে। তিনি বেশ খানিকক্ষণ ভেবে বললেন, ইংরেজি মনে আসছে না, আরবি বলতে পারবেন। আমি তা-ই বলতে অনুরোধ করলাম। এবার বুঝলাম শব্দটা। [শব্দটা ছিলো نعاس, আর তিনি আমাকে কাছাকাছি প্রতিশব্দ বললেন نوم][১]

তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। জিজ্ঞেস করলেন, 'আরবি কিভাবে শিখেছো?' আমি বললাম, আমাদের মাদরাসায় আরবি সাহিত্যও পাঠ্য, ওখানে অনুশীলন করেছি। বললেন, মাশা-আল্লাহ বেশ ভালো পারো। আমি খানিকটা লজ্জিত হয়ে বললাম, 'আমি অল্প পারি' (عرفت قليلا)। একটু হেসে আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, 'না না, অনেক পারো তুমি। অনেক কি, চমৎকার পারো!' (لا! بل كثيرا! بل ممتاز!)।

এভাবে তাঁদের সাথে পরিচয়ের সূত্রপাত। তাঁর বিশুদ্ধ ও প্রমিত আরবি'র তুলনায় আমার ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরবি বলা যে কত হাস্যকর, আমি নিজেই তা জানি। কিন্তু আমাকে একটুও বুঝতে না দিয়ে কত সুন্দর উৎসাহ দিয়ে গেলেন! এই মানুষগুলোকে না চাইতেও ভালোবেসে ফেলতে হয়!

যাবার সময় তিনি দারুসসালাম থেকে কুরআনের একটা সংক্ষিপ্ত তাফসির নিয়ে এসে গিফট করলেন! এটা ছোট আম্মুর পছন্দ হয়েছিলো, তাই তাঁকে দিয়ে দিয়েছি। ওখানে অবস্থানকালীন বেশ সুন্দর কিছু পুস্তিকা অনেকে বিতরণ করতো। কিন্তু এই জায়গায় যে পুস্তিকাটা দেওয়া হয়েছে, কিছুদূর গিয়ে দেখি আরেকটা। আবার বিশাল মাসজিদের মধ্যে সব পুস্তিকা সবাই পেতো না। আমার খুব লোভ জাগে। অনেকেই পুস্তিকাগুলো এক নজরে দেখে নিয়ে ফেলে রাখেন। প্রতিদিন তারাওয়ীহ'র পরে পুরো মাসজিদ এক চক্কর ঘুরে এসে এই পুস্তিকাগুলো আমি সংগ্রহ করতাম আর ভাঁজ করে ব্যাগে ভরে নিতাম। এসব দেখে এই দু জন ভাইয়া বেশ মজা পেতেন। একদিন একটি পুস্তিকায় ইবন আল-ক্বয়্যিম [র.] লিখিত জান্নাত বিষয়ক সুন্দর একটি কবিতায় আমি কয়েকটি লাইন বুঝতে পারছিলাম না। তাঁরা দু জন মিলে বুঝিয়ে দিলেন। এবার আমাকে বললেন, এটাকে বাংলায় অনুবাদ করো তো! আমি

---

১ نعاس শব্দটি সূরা আল-আনফাল (৮)-এর ১১ নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। نعاس এবং نوم শব্দ দুটি অর্থের দিক থেকে প্রায় কাছাকাছি হলেও এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। نعاس বলতে হালকা ও অগভীর ঘুম-কে নির্দেশ করা হয়, 'তন্দ্রাচ্ছন্নতা'-ও বলা যেতে পারে, যখন মানুষ পুরোপুরি অবচেতন হয় না, বরং অনুভূতি সজাগ থাকে। কিন্তু نوم বলতে বোঝানো হয় গভীর ঘুম, যা মানুষের চৈত্যন্য-কে পুরোপুরি সুপ্ত করে দেয়, মানুষটি মোটেও চিন্ময় থাকে না।
অথবা এক কথায় এভাবেও বলা যেতে পারে, نوم হচ্ছে ঘুম, نعاس হচ্ছে ঘুম আসার পূর্বেকার (তন্দ্রাচ্ছন্ন) অবস্থা। [রূহুল মা'আনী, খ. ৭ পৃ. ২৮]

যখনই বলা শুরু করলাম, অনুচ্চ স্বরে সে কি হাসি তাঁদের!

আরেকদিন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার প্রিয় ঋতু কোনটি? বললাম শীত ঋতু। 'কেনো?' সেই হাদিসটা শোনালাম:

"

الشتاء ربيع المؤمن ، قصر نهاره فصام ، وطال ليله فقام

"শীত ঋতু হোল মু'মিনের বসন্তকাল। দিনগুলো ছোট হয়, ফলে সে (সহজে ও কম কষ্টে) সাওম রাখতে পারে। রাতগুলো দীর্ঘ হয়, ফলে সে (পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রাম সেরে যথেষ্ট সময় নিয়ে) সালাতে দাঁড়াতে পারে।[১]"

বললেন, আমি ঠিক এই জবাবটাই চাচ্ছিলাম তোমার কাছে! আমাদেরও প্রিয় ঋতু শীত।

আমি এই ফাঁকে নিজ থেকে তাঁদের যখন জানালাম, বাংলাদেশে ছয়টি ঋতু; খুব অবাকই হলেন! বুঝলাম, তাঁদের এখানে যেহেতু চারটি ঋতু, স্বভাবতই ছয় ঋতুর কল্পনা বিস্ময়কর-ই ঠেকবে। নামগুলো বলতে বললেন। যেই বললাম 'গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত', আয়াদ ভাইয়া বললেন,

'আচ্ছা! তোমাদের বাংলাভাষাভাষী যে কারো সাথে কথা বললেই লক্ষ্য করলাম শ শ শ শ করে। কেনো? এই শা শা শু শু'র রহস্য কী? বাংলায় কি 'শীন' (ش) হরফটির ব্যবহার বেশি?'

আমি বললাম, 'أنتم أهل الضاد ونحن أهل الشين!'

দু জনে বেশ মজা পেলেন এই উত্তরে।

পাশেই পরিচিত হলাম আরেকজন দাদাভাইয়ের সাথে, যিনি পেশায় একজন চিকিৎসক। ইনি 'আল-ইত্তিফাক্ব মাআল ইখতিলাফ' (মতভিন্নতা রেখেই মতৈক্য) নিয়ে চমৎকার ভাবে আমাকে কিছুক্ষণ তাঁর অনুভূতি জানালেন। প্রায় সব মুসলিম দেশ-ই নাকি তিনি ঘুরেছেন, কেবল তাদের সংস্কৃতি ও পরিবেশের সাথে পরিচিত হবার জন্যে। বাংলাদেশেও এসেছিলেন ১৯৯৮ তে। আমাকে বললেন, 'উম্মাহর ঐক্যের জন্যে কাজ করো।' আমি দু'আ চাইলাম। তিনিও কপালে চুমু এঁকে দিলেন

---

১ সুনান আল-বায়হাক্বী আল-কুবরা: ৮২৩৯

আর দু'আ করলেন।

সুদানের একজন আঙ্কেলের কথা ভুলবার নয়। আঙ্কেল তাঁর ছোট ভাই এবং ভাতিজা সহ মু'তাকিফ ছিলেন আমার কাছ থেকে মাত্র দুই গজ দূরেই। ভাতিজা (আমার সমবয়সী) স্থায়ীভাবে সৌদিতেই থাকে। ও বেশ চুপচাপ থাকে সব সময়। মাঝে মাঝে উদাস। তাঁরাও বেশ প্রাণবন্ত ও আন্তরিক ছিলেন। বেশ মজার ছিলো তাঁর ইংরেজি বলা। এই যেমন ধরুন, আমাকে তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন 'তোমার চাচা কখন আসবেন আজকে?'- বলতেন, 'today what time coming your uncle? আবার ধরুন, বলতে চাচ্ছেন, 'আমি একটু বাথরুমে যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি চলে আসছি। আমার জায়গাটা একটু দেখে রাখবে যেন কেউ না বসে।', বলতেন, 'Uncle, I go bathroom. I come quick. You see my place, no person not sit here.' আবার মাঝেমধ্যেই বলতেন, 'When I talk you English, do not mind uncle! I can not talk this language good'

এই কয়েকটা বাক্য আমার মোটামুটি মুখস্থই হয়ে গিয়েছিলো। আমি খুব সুন্দর হাসি দিয়ে তাঁকে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করাতে এবং ভরসা দিতে চেষ্টা করতাম। মনের ভাব বোঝাতে পারাটা ভাষার প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি যা বলতে চাচ্ছেন, সেটা যেহেতু আমি বুঝে নিতে পারছি, সমস্যা কোথায় আর? এভাবে বুঝিয়ে দিলে তিনি খুশি হতেন। বেশ বিনয়ী ছিলেন তিনি। সারাক্ষণ কুরআন তিলাওয়াতেই মগ্ন থাকতেন। যাবার সময় তাঁর দেশের ঠিকানা দিয়ে গেলেন আর আমন্ত্রণ জানালেন। আমিও বাংলাদেশে ঘুরে যাবার আমন্ত্রণ জানালাম তাঁকে।

ইংরেজি জনিত কারণে কর্তব্যরত পুলিশ বা স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে কোনো ব্যাপারে সাহায্য চাইতে গেলে বিপত্তি পোহাতে হয়। কারণ, তাঁদের আঞ্চলিক আরবিগুলো যে কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। আবার ইংরেজির প্রসঙ্গ আসলে প্রায়-ই সবাই মুখ বাঁকা করতেন, না হয় একটা দায়সারা হাসি দিয়ে 'দুঃখিত' বলতেন। একজন তরুণ পুলিশ একবার সাফ জানিয়ে দিলেন, 'Sorry! No Urdu! No English!' খেয়াল করলাম, উনি আরো অনেককেই এই একই বাক্যটা বলে যাচ্ছেন! হারামে শুধু একটা তরুণ স্বেচ্ছাসেবককে পেয়েছিলাম, যে কি না ভালো ইংরেজি বলতে পারতো। মাসজিদ নাবাওয়ির 'মাকতাবা সাওতিয়াহ'র কর্তব্যরত অফিসার– তিনিও মোটামুটি ভাবে ইংরেজি বলতেন। এর বাইরে পরিচিত হওয়া সৌদি নাগরিকদের অধিকাংশকেই ইংরেজিতে সম্পূর্ণ বেদখল হিসেবে পেলাম।

এইদিকটাতে কর্তৃপক্ষের একটু নজর দেওয়া প্রয়োজন। যেহেতু ইংরেজি সমসাময়িক বিশ্বের আন্তঃভাষিক সেতুবন্ধনে রূপ নিয়েছে, সেহেতু অন্তত দায়িত্বশীল পর্যায়ের আরবদের উচিৎ মোটামুটি ইংরেজি আয়ত্তে রাখা, যাতে আল্লাহর ঘরের মেহমানদের সেবা প্রদানে বিঘ্ন না ঘটে।

আয়াদ ভাইয়াকে বলছিলাম, আমি কথোপকথনের সময় আপনাদের অনেকের কথাগুলো কিছুই বুঝি না! উনি বললেন, 'বাদ দাও ওসব! আরবদের সাথে কথা বলতে পারাটা কি আরবি শেখার লক্ষ্য? ওসব লোকাল ভাষা তুমি দু এক মাস তাদের সাথে কথা বললে এমনিতেই পারবে।' ভরসা পেলাম তাঁর অভয় দেয়াতে। তবুও ঐ ক'দিনে মোটামুটি খানিকটা রপ্ত করতে পেরেছি স্থানীয় কথ্য ভাষার বহুল ব্যবহৃত পরিভাষাগুলো।

মাসজিদ নাবাওয়িতে ওয়িতরের সালাতে সম্মানিত ইমামের দু'আ ছিলো খুবই মর্মস্পর্শী। হৃদয়ের অভাব-অভিযোগ আল্লাহকে পেশ করার কতো চমৎকার আর আবেদনঘন নিবেদন ছিলো সেই দু'আগুলোতে! মনে হয় না এই আবেগঘন আর সর্বোচ্চ বিনয়পূর্ণ দু'আয় শরিক হয়ে না কেঁদে কেউ পেরেছে! ফিলিস্তিন এবং অন্যান্য মজলুমানের জন্যে দু'আয় তো পুরো মাসজিদ বোধ করি ভেঙ্গে পড়তো। অক্ষমতার অনুশোচনা আর ভ্রাতৃত্বের কষ্টানুভূতি সব মুসাল্লিকেই কুরে কুরে খেতো ইমামের সাথে সাথে।

২৯ রমাদান চাঁদ দেখা গেলো। বিদায়ের সময় সে কি আবেগঘন অনুভূতি সবার! একবার সেই যে জড়িয়ে ধরেন, আর কেউ-ই যেনো ছাড়তে চান না।' ডাক্তার দাদাভাইয়াটা অনেকক্ষণ ধরে দু'আ করলেন, শেষ বিদায়ের আগে দুই গালে হাত দিয়ে বললেন, 'be a knwoledge leader my dear!' 'ইশার সালাতের পর চলে এলাম মেজো আব্বুর বাসায়। সুহাইমা-সাহিমের আনন্দের শেষ নেই। মেজো আব্বু বললেন, তোমার তো ঈদের কেনাকাটা হোল না। ফুফু বললেন, ও আর ওর আব্বু কোন ঈদেই তো নতুন কাপড় নেয় না। মেজো আব্বু বললেন, এইবার অন্ত নাও ভাতিজা!

ছোট আব্বুকে বললেন আমাকে সাথে নিয়ে যেতে। সবার অনুরোধে গেলাম। একটা তোব, টুপি আর পাজামা নিয়ে চলে এলাম। পছন্দমত কোনো তোব-ই মেলাতে পারছিলাম না, শেষে কোনোরকম একটা নিয়েছি। বাসায় এসে মেজো আম্মু আমার পছন্দের উচ্ছ্বসিত তারিফ করলেন। এবার কিছুটা খচখচে অনুভূতি

শেষ হোল। ওখানে ঈদের সালাত ফজরের অব্যবহিত পরই হয়ে যায়। মাসজিদ আন-নাবাওয়িতে জায়গা পেতে হলে রাত তিনটার আগেই চলে যেতে হবে। ছোটাচ্চু তাঁর গাড়িতে করে পালা করে সবাইকে দিয়ে আসলেন। বাসায় রেখে দিলেন আমাকে। আমাদের বের হতে একটু দেরি হোল। মাসজিদ নাবাওয়ীতে জায়গা পাওয়া যাবে না, এ জন্যে মাসজিদ আল-মীক্বাতেই (মাদীনাহ থেকে যাঁরা হাজ্ব বা 'উমরাহ করতে যান, তাঁদেরকে এখানেই ইহরাম পড়তে হয়) ঈদের সালাত আদায় করলাম।

এর আগে রাতেই আমরা পরিকল্পনা করেছি বদর যুদ্ধের স্থানটি পরিদর্শনে যাবার। সালাত শেষে বাসায় এসে সামান্য নাস্তা করেই আমি, ছোটাচ্চু আর মেজো আব্বু চললাম বদরের প্রান্তরে। মাঝখানে গাড়িতে জুস ফেলে ছোটাচ্চু আমার জামাটা ইয়ে করে দিলেন আর কি! বদরের যুদ্ধক্ষেত্রটি প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। ড্রাইভার আঙ্কেল বললেন, এখানে এসে অনেকেই মাটি ধরে বিলাপ করতো, মাটি নিয়ে গায়েমুখে মাখতো। আবার অনেকে কিছু মাটি সাথে করে নিয়েও যেতো। এই ধরনের শিরক থেকে বাঁচার জন্যে পুরো যুদ্ধক্ষেত্রটা দেয়াল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। তবে কয়েক জায়গায় সামান্য গলা উঁচু করলেই বেশ ভালোভাবে দেখা যায়। আমরা সাথে লাগোয়া একটি টিলায় দাঁড়িয়ে জায়গাটা দেখতে পেয়েছি। বদর! প্রেরণার বদর প্রান্তর! সাহীহ বুখারী'র কিতাবুল মাগাযী-তে যে বদর দেখেছি, সীরাত ইবন হিশামের পাতায় যে প্রান্তর-কে কল্পনা করেছি, আজ সে প্রান্তর আমার সামনে দাঁড়িয়ে। তাকবীর ধ্বনি গলা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিলো। বদর পরিদর্শন শেষেই ড্রাইভার আঙ্কেল বললেন, ইয়ানবূ' সৈকত এখান থেকে খুবই কাছে। মেজো আব্বু বললেন, 'তুমি তো লোভ জাগায় দিলে মিয়া! চলো তাইলে, ভাতিজাকে নিয়ে যাই!' আমরা সৈকতে এসে পৌঁছলাম। আরব সাগরের নান্দনিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্যে এই সৈকত খুবই চমৎকার করে সাজানো। আমাদের এখানে সমুদ্রসৈকত অনেক সময়ই নির্লজ্জতার প্রতিশব্দ হয়ে যায়। অস্তস্তিকর ও বিব্রতকর পরিস্থিতিরও সম্মুখীন হতে হয় অনেক শুদ্ধাচারী পর্যটককে। কিন্তু ওখানকার সৈকতের কী চমৎকার দৃশ্য! নারীদের মধ্যে যাঁরা সামান্য পানিতে নামছেন, পূর্ণ পর্দা বজায় রেখে নামছেন। এখানে ওখানে পিকনিক করতেও দেখা যাচ্ছে অনেককে। সাগরের মনোমুগ্ধকর ঢেউ আর নীল জলের বুকে দূর থেকে দেখা ফেনারাশি — সৌন্দর্যের অপার উৎসধারা উপভোগ করে এখানে কেউ সীমালংঘনে রত নেই, বরং সেই সৌন্দর্য ও নান্দনিকতার স্রষ্টার প্রতি যেন

কৃতজ্ঞচিত্ত হয়ে তাঁর সন্তুষ্টিকেই মূখ্যজ্ঞান করছেন। সৈকতের উপরিভাগে খেজুর গাছগুলোতে খেজুর পাকা শুরু হয়েছে, এবং কিছু ঝরেও পড়েছে। মজার বিষয় হোল, অনেকে পরিবার নিয়ে আসছেন, কিন্তু তাঁরা কেউ পানিতে নামেন না। সৈকতে গাড়ি চালিয়ে গাড়ির এক চাকা পানিতে আর অন্য চাকা পানির উপরে রেখেই তাদের আনন্দ! আবার পানি থেকে একটু উঁচুতে শামিয়ানা বিছিয়ে সবাই মিলে হাসি-খুশিতে ভোজন সেরে নিচ্ছেন। আমি আর ছোটাচ্চু পানিতে নেমে বেশ কদ্দূর গিয়ে ছবিটবি তুলে চলে আসলাম। বেশ কিছু তরুণ উদোম গায়ে একেবারে নীল জলের ওদিকে পৌঁছে যাচ্ছিলো। ড্রাইভার আঙ্কেল বললেন, ওরা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। বিশাল সাগরের দিকে স্থিরনেত্রে তাকিয়ে থাকলে শূন্যতার অনুভব খুব সহজেই ভেতরে জায়গা করে নেয়। এই অসীম জলধির বুকে নিঃসঙ্গ ও নিভৃতচারী হয়ে অহোরাত্র মুখ গুঁজে থাকার সাধ জাগে। কোলরিজ-এর একটা কবিতা ছিলো অনেকটা এরকম-ই। মনে পড়ছে না ঠিক।[১]

আমরা সৈকত থেকে উঠে এসে বাঙালী রেস্তোঁরা খুঁজে বের করলাম। ওখান থেকে সরাসরি চলে আসলাম মাসজিদ নাবাওয়িতে। এখানে যোহরের সালাত আদায় করে ফিরলাম বাসায়।

ছোটাচ্চু মাঝে মাঝে বলা-কওয়া ছাড়া হুটহাট গাড়িতে তুলে পছন্দের জায়গাগুলো ঘুরিয়ে আনতেন। হরেকদেশী মানুষ আর তাঁদের সংস্কৃতির সাথে হাতে-কলমে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। ছোটাচ্চু তার গাড়ি নিজেই বেশ ভালো ড্রাইভ করেন, আমাকেও ড্রাইভিংয়ের পয়লা সবক দিয়ে দিলেন! চাচ্চুদের মার্কেটে দুয়েকবার যাওয়া হয়েছিলো। অনেকগুলো জিনিসের নতুন আরবি নাম শেখা হোল এখানে।

হিজরতের পরে 'উসমান [রা.] মুসলমানদের পানি সমস্যা লাঘবের জন্যে যে কূপটি কিনে নিয়েছিলেন, এটা 'বীরে উসমান'[২] হিসেবে পরিচিত। আমি গুগল ম্যাপে সার্চ দিয়ে জানলাম, জায়গাটা আমাদের আশেপাশেই কোথাও। আমার দেখতে ভীষণ ইচ্ছে হোল। ড্রাইভার আঙ্কেলকে দেখালাম। উনি বললেন, খুঁজেটুজে দেখা যেতে পারে। ছোটাচ্চু, সাহিম আর আমাকে সহ নিয়ে আল্লাহর নামে বেরিয়ে পড়লেন।

---

১ কবিতাটি ছিলো:
"Alone, alone, all, all alone,
Alone on a wide wide sea!
And never a saint took pity on
My soul in agony."
[The Rime of the Ancient Mariner, Part IV]

২ بئر : কূপ

এবং খুব অল্প সময়েই আমরা কূপটির সন্ধান পেয়ে গেলাম, আলহামদুলিল্লাহ! জায়গাটা মেজো আব্বুর বাসা থেকে সর্বোচ্চ পনের মিনিটের দূরত্বে। সুবহানাল্লাহ, এই কূপ থেকে এখনো পাশের বিশাল খেজুর বাগানে পানির যোগান দেয়া হচ্ছে! কূপের পাশেই 'উসমান [রা.]'র বাসস্থানের ভগ্নাবশেষ দেখতে পেলাম। ছোটাচ্চু বললেন, 'এতদিন মাদীনাহ থেকেও এত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থানের সন্ধান পেলাম না! তোমাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতে হয়, তোমার কল্যাণে দুইটা অজানা ঐতিহাসিক স্থান চিনে ফেললাম, আলহামদুলিল্লাহ।'

সুযোগ হলেই আমরা মাসজিদ নাবাওয়িতে জামা'আতে শরিক হতাম। মেজো আব্বু বেশ রাত করে বাসায় ফিরতেন। ফুফু আর আমার সাথে পুরনো দিনের গল্পের ঝুড়ি মেলে ধরতেন। স্মৃতিগুলো এত বেশি জীবন্ত তাঁর কাছে, মাশা-আল্লাহ! জীবনকে কতভাবে কিভাবে দেখতে হয়, সেই দর্শনও চমৎকৃত হবার মতো। আমার ক্যারিয়ার আর ভবিষ্যৎ নিয়েও বেশ গাইডলাইন দিয়ে গেছেন সুযোগ হলেই। মেজো আম্মু ঐ অসুস্থ শরীরেও আমাদের যত্ন-আত্তিতে যাতে কোনো ত্রুটি না হয়, সে ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন। মেজো আম্মু তো শুধু ভালো একজন বন্ধু-ই ছিলেন না, ছিলেন আমার শৈশবের শিক্ষিকা-ও।

ছোটাচ্চুর সেই এক কাজ, বাইরে গিয়ে একগাদা ফলমূল, জুস আর দুধ নিয়ে আসা। না খেয়েও রক্ষা নেই, জোর করে গিলিয়ে ছাড়েন। ছোট আব্বু হলেন গিয়ে নীরব দর্শক। না বাজালে উনি বাজতে চান না! আবার প্রয়োজনীয় বাজনার ক্ষেত্রে সচেতন! বিশেষত ভাতিজার সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে তাঁরও উৎকণ্ঠার কমতি নেই। সার্বক্ষণিক সব প্রয়োজনে পাশে ছিলো সুহাইমা আর সাহিম। এই দুই জান্নাতী প্রজাপতি আমার ভালোবাসার বাগানজুড়ে অনুক্ষণ উড়াউড়ি করেছে। কী এক মায়ার বাঁধনে আমাকে জড়িয়েছিলো জানি না, এখনো শূন্যতা অনুভব হয়। আমার তো দেয়ার মতো সেই একটাই আছে, সবার নামের অদ্যাক্ষর দিয়ে একটা করে কবিতা গিফট করে আসলাম।

আমি দেশ ত্যাগের আগেই একটা লিস্ট করে ফেলেছি বইয়ের। মেজো আব্বু ছোটাচ্চুকে বললেন ড্রাইভার আঙ্কেলকে সাথে নিয়ে বইগুলো কিনে ফেলতে। দুই দিন বিভিন্ন লাইব্রেরি ঘুরে আমরা অধিকাংশ বই-ই পেয়ে গেলাম, আলহামদুলিল্লাহ। এর মধ্যে আবার হোল কী, আমি ভেবেছিলাম যে দারুসসালাম যেহেতু বিশ্বজুড়ে সমাদৃত প্রকাশনা সংস্থা, এখানে সবাই তার ঠিকানাটা বলতে পারবে। কিন্তু

কেউ-ই বলতে পারলেন না। শেষমেশ মনে পড়লো রাহনুমাপু দারুসসালামের বইয়ের ভক্ত-পাঠিকা! অবশেষে তাঁর শরণাপন্ন হলাম। আপু বই থেকে তাদের মাদীনাহ অফিসের ঠিকানাটা টেক্সট করে দিলেন। যারপরনাই আনন্দিত হলাম। দারুণ ঔৎসুক্য নিয়ে খুঁজে বের করে ফেললাম। বেশ কিছু পছন্দের বই নেয়া হোল। মেজো আব্বু একদিন আমি, সুহাইমা আর সাহিমকে নিয়ে বেরোলেন কেনাকাটা করতে। ওরা দু জনের পছন্দ হয়েছে এমন দুটো তোব কিনলাম। মধ্যখানে সময় করে আমরা মাদীনাহ ইউনিভার্সিটি ঘুরে আসলাম। ওখানে বেশ কিছু বাঙালি বড় ভাইয়ার সাথে কথা বললাম, পরিচিত হলাম। দু জন সম্মানিত শাইখের সাথে কথা বললাম। খুশি হলেন এবং দু'আ করলেন।

আমাদের ফিরতি ফ্লাইটের দিন ঘনিয়ে আসছে। কখন যে পঁচিশ দিন পূর্ণ হয়ে গেলো, টের-ই পেলাম না! ছয় তারিখ রাতে ফ্লাইট। আমরা প্রস্তুতি নিতে থাকলাম। সিদ্ধান্ত হোল, পাঁচ তারিখ রাতে মাদীনাহ থেকে রওনা হবো। এর মধ্যে আবার মেজো আম্মু হঠাৎ করে ধরে বসলেন, কিছু নিতে হবে। আমি আসন্ন বিদায়ের কথা ভেবে এমনিতে ভারাক্রান্ত। ছোটাচ্চু আর সুহাইমা এক প্রকার জোর করেই সাথে নিয়ে নিলো। আমি এক জোড়া জুতো, মোজা আর একটা টি-শার্ট নিলাম। ফুফা আর ছোটাচ্চু আমাদের ব্যাগ আর লাগেজগুলো ভালো করে বাঁধছিলেন।

হর্ষের প্রহরগুলো খুব দ্রুত ফুরিয়ে গেলো, বিষাদের কালো ছায়া ক্রমশ ঘিরতে শুরু করলো, যখন শেষবারের মতো প্রিয় নবীজিকে সালাম দিয়ে এলাম আর মাসজিদ নাবাওয়িতে শেষ সালাত আদায় করে ফিরলাম, রাহমাতের ফল্গুধারা থেকে ক্রমে ক্রমে নিজেকে শুধু বঞ্চিত মনে হতে শুরু করলো। সুহাইমা খুব করে বলছিলো, 'ভাইয়া! আর দুটো দিন পরে যাওয়া যায় না?' সাহিম বলছিলো, 'দুইদিন না হলেও একদিন থাকেন না ভাইয়া! প্লিজ!' আমার তখন বলার কিছু থাকে? কষ্টগুলো দলা পাকিয়ে নিজেই গিলে ফেললাম। নতুন বাবু সাহিলও বিড়বিড় করে তাকিয়ে থেকে মায়ার বাঁধনে আটকে ফেলেছিলো। মেজো আব্বু, মেজো আম্মু, ছোট আব্বু, ছোটাচ্চু — তাঁদেরও বিদায়ের একটা অপ্রস্তুত অনুভূতি। অবশেষে ভালোবাসার সবগুলো অধ্যায়ের সমাপ্তি টেনে আমরা পাঁচ তারিখ রাতে রওনা হলাম মক্কার উদ্দেশ্যে। গাড়ি পরবর্তী মোড়ে অদৃশ্য হবার আগ পর্যন্ত সুহাইমা ও সাহিম ঠাঁয় দাঁড়িয়ে ছিলো রাস্তায়। ওদের নির্বাক চাহনিকে ভুলে গিয়ে প্রিয় রাসূলের শহরকে আমরা বিদায় জানালাম।

বিদায় মাসজিদ কুবা, বিদায় মাসজিদ আন-নাবাওয়ি, বিদায় উহুদ, বিদায়, বিদায়!

বিদায় হে মাদীনাতুর রাসূল...

ছয় তারিখ ভোরে আমরা মক্কায় পৌঁছলাম। এখান থেকে রাতে এয়ারপোর্টের উদ্দেশে রওনা হবার কথা। এবার হোটেল পেলাম বায়তুল্লাহ থেকে একেবারে কাছে। আমরা শেষবারের মতন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলাম। এখন মানুষের ভীড় একদমই নেই। প্রাণভরে বায়তুল্লাহকে দেখতে পেলাম। হাতীমে কা'বার ভেতরে সালাত আদায়ের সুযোগ পাই নি গেলবার, এবার তাওয়াফকারীর সংখ্যা কম হওয়ায় পেয়ে গেলাম, আলহামদুলিল্লাহ। প্রিয় কা'বাকে শেষ বিদায় জানাবার অনুভূতি প্রকাশ কিভাবে করি? এ কেবল কা'বার মালিকই জানেন।

মালিক আমার! ইচ্ছা-অনিচ্ছায় সংঘটিত ভুলগুলো তুমি ক্ষমা করে দিয়ে আমাদের 'উমরাহ ক্ববূল করে নাও। তৃষিত হৃদয়কে প্রশান্ত করতে আবার কখনো বায়তুল্লাহর দর্শন-সুধা পানের সুযোগ পাবো কি-না, জানি না। তোমার কা'বার আঙিনায় প্রস্রুত অশ্রুর ফোঁটাগুলো দিয়ে আমার ভুল-ভ্রান্তির অগ্নিতাপ নিভিয়ে দিও, মালিক!

বিয়ের কবিতা : জীবনের কবিতা

এক

ভালোবাসার মানুষগুলোর বিয়েতে দাওয়াত পাওয়ার পর আমি সশরীরে উপস্থিত হতে না পারলেও গিফটটা পাঠিয়ে দিতে চেষ্টা করি। আমার পক্ষ থেকে গিফট সব সময়-ই এক রকম, খুব সাধারণ: দুইজনের জন্যে দুইটা বই, আর দুইজনের প্রতি দু'আ ও ভালোবাসা জানিয়ে উভয়ের নামের অদ্যাক্ষর দিয়ে মিলিয়ে একটা কবিতা লিখে বাঁধাই করে দেই। এবার দুইটা গল্প বলি।

ক

যেই দিনটার কথা বলছি, তার পরেরদিন ছিলো ডাক্তারনি বুবুর বিয়ে। পরীক্ষার কারণে আমি ওয়ালিমায় উপস্থিত থাকতে পারছিলাম না। তবুও কবিতা লিখতে বসে গেলাম। মজার বিষয়, উভয়ের নামের সবগুলো বর্ণ মিলালে ১৪টা হয়। তার মানে একটা সনেট লিখে ফেলা যায় অনায়াসে! কিন্তু যথারীতি দ্বিধায় পড়ে গেলাম, কার নাম দিয়ে শুরু করবো, এই নিয়ে। আমি জানতে চাইলাম,

: বুবু, কার নামটা আগে দেবো?

: তোর ইচ্ছা!

: উঁহু! বলে দে প্লিজ।

: আচ্ছা, তোর ভাইয়ারটা আগে দে।

খ

মোটামুটি নিকটাত্মীয় বলা যায়, এমন একজন ভাইয়ার বিয়ের দাওয়াত পেলাম। আমি যেহেতু অখন্ড অবসরে আছি, এমনিতেই কবিতা লিখে দিতাম একটা, কিন্তু ভাইয়াটা দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথে স্মিত হেসে বললেন, 'একটা কবিতার আবদার রাখতে পারি তো!' তার মানে আমাকে দ্বিগুণ উৎসাহে কবিতা লিখতে হবে! যথারীতি বসে গেলাম। এবারও দ্বিধায় পড়লাম। আমার কবিতা লেখার স্টাইলটা বুঝিয়ে দিয়ে তাঁকেও জিজ্ঞেস করলাম। আলাপনটা প্রায় একই রকমের,

: ভাইয়া, কার নামটা আগে রাখবো?

: তোমার যেটা সুবিধা হয়।

: আপনি বললেই খুশি হবো ভাইয়া।

: তাহলে উনার নামটা আগে রাখো।

দুই

আমি আসলে দুটো গল্প শোনাতে চাই নি, দুটো বাক্য শোনাতে চেয়েছি:

'তোর ভাইয়ারটা আগে দে।'

'উনার নামটা আগে রাখো।'

তিন

খাতা-কলমের কবিতার ক্ষেত্রে এই দুটো বাক্য যেমন প্রোজ্জ্বল আভায় দীপ্যমান, জীবনের কবিতায় বাক্য দুটোর সার্থক প্রয়োগ কেমন স্বর্ণোজ্জ্বল দ্যুতি ছড়াতে পারে?

ভাবছিলাম, এই দুটো বাক্যের যে দর্শন, দুটো হৃদয়ের যুগল পথচলায় বিশ্বাস ও বিশুদ্ধতাকে অমলিন রাখার জন্যে এর চে' বেশি কিছু দরকার আছে কি না!

পরীক্ষার গল্প

এক

পরীক্ষার হলে উপস্থিত হলেন। ইনভিজিলেটর আসলেন। নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা শুরু হোল। প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে আপনি এক দফা হেসে নিলেন। আপনার জানাশোনা বিষয়-আশয় থেকেই প্রশ্ন এসেছে। শতভাগ 'কমন'। হলের ভেতর কেউ ভ্রূ কুঁচকাচ্ছে, কেউ মাথার চুল ছিড়ছে, আর কারো চোখ ছানাবড়া হয়ে আছে। বাকিরা যে যার মত লেখা শুরু করেছে। আপনি মোটামুটি আত্মবিশ্বাসী, আপনি এদের সবার চেয়ে ভালো উপস্থাপনা করতে পারবেন। ভাবতে ভাবতে আপনি খাতায় কিছুই লিখছেন না। পরীক্ষার নির্ধারিত সময় ধীরে ধীরে ফুরিয়ে এসেছে। আপনি আগাগোড়া সাদা খাতা জমা দিয়ে এলেন। ইনভিজিলেটর অবাক!

: কী ব্যাপার? তুমি কিচ্ছু লিখলে না? পুরোদস্তুর সাদা খাতা জমা দিয়ে যাচ্ছো!

: স্যার, আমার জ্ঞান, প্রশ্নকৃত বিষয় সম্পর্কিত সব প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ — সব তো আমার মস্তিস্কে জমা আছে! খাতায় লেখার কী দরকার?

পরীক্ষার দিন স্যার কিছু বললেন না। রেজাল্ট প্রকাশের দিন দেখলেন, আপনার নামটা কোথাও নেই! স্যার সেদিন আপনাকে একঝলক দেখে যখন 'বোকা ছেলে কোথাকার!' বলে ভর্ৎসনা করলেন, তখন আপনার বুক ভেঙ্গে গেল। এত পড়ালেখা আর জানাশোনা সব অর্থহীন হয়ে গেল!

দুই

আপনি বিশ্বাস করেন, পৃথিবীটা আপনার জন্যে একটি পরীক্ষাক্ষেত্র, আখিরাতে সব পরীক্ষার্থীর রেজাল্ট প্রকাশ করা হবে।

আপনি এই পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সিলেবাস— আল-কুরআন এবং আস-সুন্নাহ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। সাধ্যানুসারে জানার চেষ্টা করেন, পড়েন, লিখেন, ভাবেন অনেক কিছু। অথচ আপনার দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরায়, উঠা-বসায়, কথা-বার্তায় কিংবা আচরণে একটু-ও প্রতিফলন ঘটে না তার। আপনি ঠিক সেই পরীক্ষার্থীর মতই দিব্যি বলে বেড়ান,

'ইসলাম তো আমার অন্তরেই আছে। বাইরে প্রকাশের কী হোল?'

তিন

আপনাকে দুটো সমীকরণ আবার দেখাই:

ক) আমার জ্ঞান তো আমার মস্তিস্কে জমা আছে! খাতায় লেখার কী দরকার?
খ) ইসলাম তো আমার অন্তরেই আছে। বাইরে প্রকাশের কী হোল?

এবার একটু ভেবে দেখুন...

প্রথম ব্যক্তিটার মতো আপনার চূড়ান্ত রেজাল্ট প্রকাশিত হবার দিন আল্লাহ্র কাছে আপনিও ঠিক এভাবে বোকা হয়ে যাবেন না তো! আপনার জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা সব অর্থহীন হয়ে যাবে না তো!?

চিন্তা করা দরকার না!?

চার

একটু চিন্তা করার কথা বলছি কেনো জানেন? কারণ, দ্বিতীয় পরীক্ষার রেজাল্টের পর আপনার চিন্তা করার অবকাশ-ই থাকবে না। কিংবা চিন্তা করলেও তা কোনো কাজে আসবে না।

প্রথমে উল্লিখিত পরীক্ষায়, মানে পার্থিব কোন পরীক্ষায় যদি আপনি অকৃতকার্য হন, তাহলে সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে দ্বিতীয়বার কোমর বেঁধে পড়াশোনা করে আবারো

পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আছে। প্রথমবারের ব্যর্থতাকে দ্বিতীয়বার সফলতায় রূপান্তর করার ফুরসত আছে। কিন্তু কিয়ামাতের দিন রেজাল্ট পাবার পর আপনাকে সে সুযোগ দেয়া হবে না! আল-কুরআন কী বলছে শুনুন:

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ

"সেখানে তারা আর্তচিৎকার করে বলবে, হে আমাদের রব্ব! আমাদেরকে এখান থেকে বের করুন। আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব না। (আল্লাহ বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে এতটা সময় দেই নি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় তা চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব (আযাবের স্বাদ) আস্বাদন কর। সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই।" [১]

তাহলে চলুন, সময় থাকতেই আমরা চিন্তা করি, সতর্ক হই, সচেষ্ট হই! অবহেলায়, অবচেতনে অকৃতকার্য হতভাগ্যদের কাতারে যেনো না পড়ি আমরা! চূড়ান্ত সাফল্যের আনন্দে যেনো আমরা এক চিলতে হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে দিতে পারি, তার জন্যে আজ থেকে, এখন থেকেই মনোযোগী হই...!

---

১ সূরা ফাতির ৩৫:৩৭

পারঘাটা পার হলে

এক

এই প্রথম নৌকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হোল আমার। কখনো নৌকা ভ্রমণ করি নি জানার পর থেকে মাসুম পরিকল্পনা করে বসে ছিলো আমাকে বুড়িগঙ্গা নদীতে নিয়ে যাবার। কোনো অজুহাতে কাজ হোল না, অবশেষে তিনি নিয়েই ছাড়লেন! এই নদী দূষিত হতে হতে পানির রঙ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সদরঘাটের কাছেই একটা খেয়াঘাট থেকে আমরা নৌকায় চড়ে বসলাম। অন্য ধরনের পুলক অনুভূত হয়েছে। মৃদু ঢেউয়ের তালে তালে নৌকার দোদুল দুল বেশ উপভোগ্য, আসলেই! আমি প্রথমবার নৌকায় চড়ার কারণে হয়তো এত বেশি উৎফুল্ল ছিলাম।

সেদিন মোটামুটি মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হচ্ছিলো। আবার নৌকায় যাত্রীও ছিলো পূর্ণ। একে তো আমি ভীতু প্রকৃতির, তার ওপর সামান্য দুলতেই বুকের ভেতরটা কেমন আঁতকে ওঠে। দুরু দুরু কাঁপতে থাকি অজানা কোনো শঙ্কায়। মাঝ নদীতে এসে যখন ঢেউয়ের ভাঁজের সাথে নৌকার চলা খানিক বেঁকে যায়, তখন অনায়াসেই আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের চিন্তাটা মনে এসে যায়। অসহায়ত্বের ক্ষণগুলো বিমূর্ত হয়ে ওঠে আল্লাহর স্মরণ ও শরণ-প্রার্থনায়।

দুই

নৌকায় বসে ভাবছিলাম, আচ্ছা, এই যে আমি, ওপারে গিয়ে কি আল্লাহর স্মরণে ক্বিলিত হৃদয় আর তাঁর কাছে নিজের ক্ষুদ্রত্ব নিবেদনের কথা ঠিক এভাবে মনে থাকবে তো আমার?

জীবনচক্রের ঘূর্ণিতে কী ঘটছে আসলে? যাপিত জীবনের পথচলায় আমরা প্রতিটি ক্ষণেই আল্লাহকে ভুলে চলেছি। কিন্তু যখনই বিপদ-শঙ্কা আর অসহায়ত্বের কাছে হেরে যেতে বসি, তখন আবার আল্লাহর কাছেই ফিরে আসি। কিন্তু আল্লাহ তাঁর করুণায় যখন আমাদের উদ্ধার করেন সেই সঙ্গিন অবস্থা থেকে, আমরা বরাবরের মতোই অকৃতজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হই।

কুরআনের এই আয়াতটি বারবার মনে পড়ছিলো আর নিজের অবস্থান নিয়ে ভাবছিলাম:

> فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ
> "তারা যখন জলযানে আরোহণ করে, তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা আল্লাহর সাথে শরীক করতে থাকে।" [১]

তিন

ভাবছিলাম, এই বিপদসংকুল, ফেনিল স্রোতে উত্তাল মাঝনদীতে আমিও তো পরম আকুতির প্রেক্ষণে তাঁকে দেখছি, চরম অসহায়ত্ব নিবেদন করছি সপ্রীত স্মরণে।

আল্লাহ্ তীরে পৌঁছে দেয়ার পর আমার সকৃতজ্ঞ হৃদয় কি ঠিক এভাবেই তাঁর স্মরণে বিগলিত হবে?

প্রভু! নদীপার হবার মতই জীবনের নানা পর্যায়ে পারঘাটা পার হলেও যেন তোমার স্মরণ থেকে গাফেল না হই।

'জলযানে আরোহী' আমি এবং 'স্থলে পৌঁছে যাওয়া' আমি — দুই 'আমি'কে তুমি এক করে দাও, মালিক।

---

১ সূরা আল-'আনকাবূত ২৯:৬৫

কল্পকথার গল্প নয়

সাহাবাদের প্রখর উপস্থিত বুদ্ধি এবং দ্বীনের জ্ঞানে তাঁদের পান্ডিত্যপূর্ণ প্রজ্ঞার কিছু গল্প পড়ছিলাম 'طريق الإسلام' থেকে। দুটো গল্প খুব চিন্তাজাগানিয়া বলে মনে হোল। আমরা সে দুটো গল্প অনুবাদের চেষ্টা করবো, ইন শা আল্লাহ।

এই ঘটনা দুটো থেকে বোঝা যায়, ইসলামের সূচনাপর্ব থেকেই আল-কুরআন এবং আস-সুন্নাহ'র নির্দেশনার ব্যাপারে কোন কোন মুসলিমের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রান্তিকতা অবস্থান নিয়েছিলো। এখনো আমরা অনেককে দেখতে পাই, যাঁরা (১) কারো ঈমান-আমল নিয়ে বাহ্যিক বিচারে একটি নেতিবাচক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান, সুস্থির হয়ে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পান না। (২) আবার অনেকেই খুব সহজে বলে ফেলেন: 'এই কথা কুরআনে কোথাও নাই, মানতে হবে কেন?'

আমি এই নিয়ে আমার কোন পর্যালোচনা বা মতামত পেশ করছি না। সাহাবাদের [রা.] জীবন থেকে ক্রমানুসারে দুটো গল্প শুধু উল্লেখ করছি। এই দুটো গল্প উপরিউক্ত দুই প্রান্তিকতা নিরসনে সহায়ক হবে, ইন শা-আল্লাহ।

এক

একজন রমণী বিবাহ করলেন এবং ছয় মাস পরে একজন শিশু জন্ম দিলেন। সবাই প্রধানত এটাই জানত যে, কোন রমণী সাধারণত গর্ভধারণের নয় মাস অথবা সাত মাস পরে সন্তান জন্ম দেন। সুতরাং, কিছু লোক ধারণা করলো যে ঐ রমণী তাঁর

স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত নন এবং বিবাহের আগেই অন্য কারো সন্তান তিনি গর্ভে ধারণ করেছেন।

তারা সবাই মহিলাকে খলিফার কাছে নিয়ে চললো শাস্তি প্রদানের জন্যে। ঐ সময় খলিফা ছিলেন 'উসমান ইবন 'আফফান [রা.]। তাঁরা যখন খলিফার কাছে গেলেন, তখন 'আলী [রা.]-কে খলিফার কাছে বসা পেলেন। 'আলী [রা.] বললেন: এই ব্যাপারে তোমাদের তো মহিলাকে শাস্তি দেবার কিছুই নেই। তারা অবাক হলো এবং জিজ্ঞেস করলো: সেটা কিভাবে?

অতঃপর তিনি বললেন:

"আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ('তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস')[১] অর্থাৎ, গর্ভ ধারণ ও দুগ্ধপ্রদানের মোট সময় হোল ত্রিশ মাস।

আবার আল্লাহ এ-ও বলেছেন: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ('আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু বছর দুধ খাওয়াবে')[২] অর্থাৎ, দুগ্ধপ্রদানের সময় হোল দুই বছর। মানে চব্বিশ মাস।

সুতরাং, গর্ভ ধারণের সময় তো মাত্র ছয় মাস[৩] হওয়াও সম্ভব!"

দুই

একজন মহিলা শুনলেন যে, 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ [রা.] ঐ মহিলাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন, যারা সৃষ্টিগত গঠনকে বদলে ফেলে, অতঃপর সৌন্দর্যের জন্যে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে এবং ভ্রূ উপড়ে ফেলে। মহিলা তাঁর কাছে গেলেন এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। তিনি মহিলাকে বললেন:

"স্বয়ং রাসূলুল্লাহ [ﷺ] যাকে অভিসম্পাত করেছেন, আমি তাকে কিভাবে

---

১ সূরা আল-আহক্বাফ ৪৬:১৫

২ সূরা আল-বাক্বারাহ ২:২৩৩

৩ 'আলী [রা.] এভাবে হিসেবটি করেছেন: কুরআনের দুইটি আয়াত অনুযায়ী,
গর্ভ ধারণ + দুগ্ধপ্রদানের সময় = ৩০ মাস
দুগ্ধপ্রদানের সময় = ২৪ মাস
সুতরাং, গর্ভধারণের সময় = (৩০ - ২৪) = ৬ মাস

অভিসম্পাত না করে পারি? এ যে আল্লাহর কিতাবেই আছে!”

মহিলা বিস্মিত এবং অবাক হয়ে বললেন, “আমি পুরো কুরআন পড়েছি, কিন্তু এমন কিছু পাই নি, যা এ সবকিছু সম্পাদনকারী মহিলাদের অভিসম্পাত করাকে নির্দেশ করে।”

এখানে ফাক্বীহ ‘আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘উদ [রা.]-এর প্রজ্ঞা প্রকাশ পায়, যেহেতু তিনি দ্বীনকে ভালোভাবেই বুঝেছেন। তিনি মহিলাকে প্রশ্ন করলেন,

“আপনি কি কুরআনের এ আয়াতটি পড়েন নি,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

রাসূল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করো, এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো[১]?

মহিলা বললেন: বটে!

ইবন মাস‘উদ [রা.] বললেন: তাহলে তো বোঝা যাচ্ছে, এ সব কাজ থেকে কুরআনও নিষেধ করে!

---

১ সূরা আল-হাশর ৫৯:৭

একটি দিনলিপি অথবা কুকুর উপাখ্যান

সেন্ট্রাল লাইব্রেরির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। প্রধান ফটক খুলতে আরো বিশ মিনিট বাকি। অদূরে একটা কুকুর শুয়ে আছে। প্রাণীটার চোখের দিকে তাকিয়ে মায়া জন্মায়। বিশ্বস্ততার কাব্যিক উদাহরণ হয়ে আছে এই চারপেয়ে। অথচ আমরা কতভাবে কতবার মানুষের বিশ্বাসে আঘাত হানি! কুকুরটা এখানে অনাদরে পড়ে আছে, পশ্চিমের কোনো দেশে হলে তার যত্ন-আত্তিতে একটুও কমতি হতো না। মানুষের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য নিয়ে ভাবি। পশ্চিমাদের কাছে কুকুর খুব সমাদৃত, আমাদের কাছে নয়। আবার আরবদের কাছে উট খুব সমাদৃত, কিন্তু পশ্চিমাদের কাছে নয়। স্থানিক ভেদ, অভিরুচির বৈচিত্র্য কিংবা প্রয়োজনীয়তার তারতম্যের কারণে এসব পার্থক্য ঘটে থাকে। স্টেইন-এর উপন্যাস 'দ্য আর্ট অব রেইসিং ইন দ্য রেইন'-এ একটা মজার বিষয় জেনেছিলাম। মঙ্গোলিয়ার অধিবাসীরা কুকুরের মৃতদেহ পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরটাতে গিয়ে কবর দিয়ে আসে, যেন কেউ কোনোভাবেই তার উপর হেঁটে যেতে না পারে! কতটুকু ভালোবাসা, চিন্তা করা যায়?

আম্মুর ফোন আসে। মোবাইলে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে দেখে একজন অপরিচিত আগন্তুক এগিয়ে আসেন। পরিচয় পেলাম, আমাদের ছোটভাই, এবার নতুন ভর্তি হবে, 'ফার্স্ট চয়েস' রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বাড়ি চট্টগ্রাম। পরিচয়পর্ব সেরে যখন কারো মুখেই কোনো কথা আসছে না, তখন বললাম, 'মঙ্গোলিয়ার কথা শুনেছো না ভাইয়া?' গলা উঁচিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বললো, 'হ্যাঁ ভাইয়া। হঠাৎ এই প্রশ্ন যে?' আমি খানিক লজ্জা পেলাম। কী জবাব দেব এখন? কুকুর নিয়ে ভাবতে গিয়ে

মঙ্গোলিয়ায় চলে গেছি, এ কথা বললে হাসবে না? ধুর, প্রশ্নটা না করলেই হতো! তবু বলে ফেললাম। সংকোচের কী আছে? আমি তো অন্যায় কিংবা অযাচিত কিছু বলি নি বা ভাবি নি। ছেলেটা মিটিমিটি হাসে। আমার সাথে কেউ একাত্ম হলে তাকে খুব তাড়াতাড়ি আপন করে ফেলি এবং অধিকার দেখিয়ে বসি। এটা অনেক ক্ষেত্রে ভোগালেও উপকারও কম করে নি। যথারীতি সময় কাটাতে ওকে প্রশ্ন করলাম, 'মঙ্গোলিয়ার একটা বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে পারো, ভাইয়া?'

'ল্যান্ডলকড?'
'ইয়াহ!'
লাইব্রেরি তখনো খোলা হয় নি। সময় তো কাটে না! ছেলেটাও চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আমি-ই কথা বাড়ালাম। 'আচ্ছা ভাইয়া, মঙ্গোলিয়ার কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের কথা বলতে পারো?'

জিব কাটে ছেলেটা। আমাদের পাশেই দাঁড়িয়ে প্রতিবেশী ডিপার্টমেন্টের একজন বড়ো ভাইয়া কথাবার্তা শুনছিলেন, আমি এতক্ষণ খেয়াল করি নি। উনি সোৎসাহে বললেন, 'আছে তো! চেঙ্গিস খান মঙ্গোলিয়ার না?' কথা বলার ভঙ্গিতে সিনিয়রিটির ছাপ ও আবেদন-কে ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা খুব স্পষ্ট। গাম্ভীর্যের এই রূপটা মাঝেমধ্যে উপভোগ্য-ই বটে। তবে না থাকলেই সুন্দর লাগে বেশি। তরশুদিন চট্টগ্রামে আবরার ভাইয়া আর ওমর ভাইয়ার সাথে দুইটা প্রহর কাটিয়েছি, আন্তরিকতাপূর্ণ কথা-হাসি এবং সারল্যদীপ্ত মুখাবয়ব তাঁদেরকে কী দারুণ বাঙ্ময় করে তুলেছিলো আমার কাছে! ভাবি, দুনিয়ার সব জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকেই যদি এমন করে পেতাম, এমনভাবে দেখতাম!

চেঙ্গিস খানের নাম শোনার পরে ছেলেটা বললো, 'ভাইয়া, এই লোকটা মুসলমান হয়ে এমন অত্যাচার কিভাবে করলো?'

বুঝলাম, চেঙ্গিস খানকে নিয়ে ওর পড়াশোনা খুব গভীর নয়। চেঙ্গিস খান-এর উপর লেখা হ্যারল্ড ল্যাম্ব-এর বইটা পড়ার জন্যে পরামর্শ দিলাম। সেই সাথে চেঙ্গিস খানের আচরিত ধর্ম 'টেনগ্রিজম' নিয়ে অল্প আলোকপাত করলাম।

ও একটু সাহস করে বললো, 'ভাইয়া, একটা সামান্য প্রসঙ্গ থেকে কোথায় চলে এলেন!' প্রশ্নের সাথে হাসি ছিলো এবং সেই হাসিতে আরো কিছু জানতে চাওয়ার সধৈর্য কৌতুহল ছিলো। আরেকটু পরখ করে যখন নিশ্চিত হলাম, বকবক করা সে

উপভোগ করছে, চালিয়ে গেলাম।

প্রসঙ্গা থেকে দূরে চলে যাওয়া আমার পুরাতন রোগ। এরকম বেশ কিছু মজার অভিজ্ঞতা আমার আছে। কোনো একটা বিষয় সামনে এলে, কোনো শব্দ কোথাও শুনতে পেলে, কোন দৃশ্য চোখে দেখলে আমার মস্তিষ্ক 'বার্ড আই ভিউ' নিতে অনেক উপরে উঠে স্থির হয়ে যায়। তারপর এই প্রসঙ্গো কিংবা তার কাছাকাছি কোনো প্রসঙ্গো কী পড়েছি, কী ভেবেছি, কী দেখেছি কিংবা কী বুঝেছি — সেসব নিয়ে ভাবনা শুরু হয়ে যায়। সেই বিষয়টার সদৃশ কোনোকিছু খুঁজে পেলে ভালো লাগে, এমনকি একটা শব্দ হলেও। একটা উদাহরণ দেই। গেল বছর বান্দরবান বেড়াতে গিয়েছিলাম। পাহাড় বেয়ে উঠতে উঠতে ছোটভাই জিজ্ঞেস করলো, 'ভাইয়া, বইয়ে যে পড়েছি, চাকমা মারমা এরকম অনেক উপজাতি এখানে থাকে, ওরা কই? এখনো কাউকে দেখি নি কেন?' আসলে দেখার কথা নয়। আমরা তো ঘুরছি বিভিন্ন ট্যুরিস্ট স্পটে (মেঘলা, নীলাচল ইত্যাদি)। এখানে আদিবাসী কিংবা অন্য কেউ বাস করার কথা নয়। আমি তাকে বুঝিয়ে বলার আগেই মাথায় ঘুরতে শুরু করলো 'মারমা' শব্দটা। মনে হচ্ছিলো, উপজাতির নাম ছাড়াও ভিন্ন কোনো অর্থে ভিন্ন কোনো জায়গায় শব্দটা আমি পড়েছি। কিন্তু ঠিক স্মরণে আসছিলো না। ব্যস, আমি ওটা নিয়েই ভাবতে শুরু করলাম। ছোটভাই জবাবের অপেক্ষায় হা করে আছে, আমার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কয়েক মিনিট পর ধ্যান ভেঙ্গো হুররেএএ শব্দ করে ওকে বললাম, 'মনে পড়েছে!' সে তো অবাক! 'কী মনে পড়েছে ভাইয়া?' আমি নির্লিপ্ত ভঙ্গিাতেই জবাব দিলাম, 'মারমা মনে পড়েছে!'

ভ্রূকুঞ্চিত মুখাবয়ব দেখে ওকে আর প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে জ্ঞান দেওয়া শুরু করলাম,

'একটা নতুন শব্দ শেখাই তোমাকে। আরবি-তে 'মারমা' (مرمى) মানে কী, জানো? গোলপোস্ট। ঐ যে ফুটবল খেলায় গোলপোস্ট থাকে, ওইটা।'

[কেউ আবার ভেবে বসবেন না, 'মারমা' উপজাতিদের নামটা আরবি থেকে এসেছে। এটা নিরেট কাকতালীয় ও উচ্চারণগত মিল, ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে এতদুভয়ের মধ্যে কোনো যোগসাজেশ নেই।]

বেচারা খুব আশাহত হোল। ঘুরতে এসেও বড় ভাইয়ার পড়াশোনার অত্যাচার! ওর চেহারা দেখেই বুঝে নিলাম, এই অবস্থায় মাস্টারি করাটা নিরেট একটা নিরস

ব্যাপার। ক্ষান্ত হলাম বটে, শান্ত হলাম না। মাথায় আবার ঘুরঘুর করতে লাগলো مرمى শব্দটার শব্দমূল দিয়ে কুরআনে কোথায় জানি কী পড়েছিলাম! আব্বু পাহাড় বেয়ে উঠতে উঠতে কথা বলছিলেন ছোটখালুর সাথে। উনাদের কথার এক ফাঁকেই সাহস করে আব্বুকে জিজ্ঞেস করে বসলাম, 'আব্বু, এই যে رمى দিয়ে কুরআনে একটা আয়াত আছে না? বলতে পারবেন একটু?'

আব্বু অবশ্য এরকম আকস্মিক প্রশ্নে অবাক হন না। কারণ, এরকম আচম্বিৎ এবং অপ্রাসঙ্গিক বহু প্রশ্ন হুট করেই আমি করে বসি। আব্বু নিশ্চয় বুঝে নিয়েছেন, কোনো একটা বিষয় অথবা শব্দ নিয়ে আমার মাথায় কিছু ঘোরাঘুরি করছে। একটা হাসি-ই দিলেন শুধু। খালুজান উচ্চৈঃস্বরে হেসে বললেন, 'হঠাৎ আয়াত নিয়ে..?' আমি বলি, 'ঐ যে মারমা! ওখান থেকে!' আগামাথা কিছু বুঝতে না পেরে তাঁর হাসির মাত্রা বেড়ে যায়। আমার ফ্যাকাশে মুখে তাঁর জন্যে করুণা ঝরে পড়ে। এতগুলো ক্যালরি খরচ করে দেয়া হাসি আমার কাছে কোনো মূল্য পাচ্ছে না দেখে বেচারা-ও আশাভঙ্গের বেদনায় কাতর হয়ে গেলেন। হাসি থেমে গেলো তার। শুরু হয়ে গেলো আমার হাসি। আয়াতটা যে মনে পড়ে গেছে! কিন্তু সেই হাসি দেখে পাছে উনারা পাগল ভাবেন কি-না, এই আশঙ্কায় একটু পেছনে ফিরে ছোটবোনের ওপরেই হাসিটা ঝেড়ে নিলাম। উদ্দেশ্য, হাসি দেখে সে কিছু একটা আমাকে জিজ্ঞেস করুক। তা-ই হোল। সবকিছু সংক্ষেপে বলে আয়াতটা শোনালাম ওকে:

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

"আপনি যখন নিক্ষেপ করছিলেন, তখন আপনি নিক্ষেপ করেন নি, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ।[১]"

হাসাহাসি দেখে নাসিম একটু কাছে এসেছিলো, আবার আরবি শব্দটব্দ পড়ছি দেখে দূরত্ব বজায় রাখলো। আমি নিজে ওকে ডেকে বললাম, 'এবার আর কিছু শেখাবো না ভাই! এই আয়াতের সাথে মজার গল্প আছে! ঐটা শোনাবো।' অতঃপর ঘর্মসিক্ত দেহে পাহাড়ে চড়ার ক্লান্তি ভুলে ওদেরকে বদরের কাহিনী শোনাই, প্রিয় নবীজির [ﷺ] সাহসিকতা, সাহাবাদের অবিচল ঈমান আর আসমানী মদদের গল্প শোনাই।

এবার খুব একটা রাগ করলো না। গোগ্রাসে কথা গিলছে দেখে আমিও শান্তি পেলাম।

---

১ সূরা আনফাল ৮:১৭

দশম শ্রেণিতে ফার্স্ট সেমিস্টার পরীক্ষায় গণিতে এ+ পেলাম না। সব বিষয়ে ৯০+ নম্বর আছে, আর গণিতের এই দশা দেখে মাসুম বিল্লাহ স্যার ভীষণ রকম আশাহত হলেন, একইসাথে ক্ষুব্ধ-ও হলেন। আমার কী করার আছে? স্যার যখন ক্লাসে পিথাগোরাসের উপপাদ্য বোঝাচ্ছেন, তখন আমি সামনের সারিতে বসে থেকেও ক্লাসে নেই। আমার মন চলে গেছে বারট্রান্ড রাসেলের 'অ্যা হিস্টরি অব ওয়েস্টার্ন ফিলসফি'- তে। এই বইয়ের 'পিথাগোরাস' চ্যাপ্টারে অনেক কথা-ই আমি বুঝি নি, অনেক শব্দের মর্মার্থ উদ্ধার করতে পারি নি; ক্লাসের মধ্যে সারাক্ষণ সেই চিন্তায় অস্থির থাকতাম।

স্যার যখন হোয়াইটবোর্ডে কিছু আঁকতেন, তখন আমার মাথায় ঘুরতো জিওমেট্রির আঁতুড়ঘর প্রাচীন মিশরের মেসোপটেমিয়ান সভ্যতার কথা। এতক্ষণ যেসব কথা পেটে চেপে রেখেছি, স্যার চলে গেলে কোন একটা ক্লাসমেটকে ধরে আচ্ছামতন বকবক করে যেতাম। ঈজিপশিয়ান গড আর মেসোপটেমিয়ান গড-এর পার্থক্য বোঝাতাম। কেউ হাসতো, কেউ আগ্রহ নিয়ে শুনতো।

আমার এই অপ্রাসঙ্গিকতাপ্রেমের মাশুল দুইটা সিমেস্টারের গণিত পরীক্ষায় দিয়েছি। স্যার অর্ধবছর আমার উপর খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন, আমাকে মুখ ফুটে না বললেও কথায় এবং আচরণে বুঝে নিতাম। রিভিশন পর্বে যেদিন ত্রিকোণমিতি শুরু হচ্ছে, সেদিন ত্রিকোণমিতি'র ইংরেজি জিজ্ঞেস করলেন আতিক-কে। ও বললো 'ট্রিগোনোমেট্রি'। আমি হাত তুলে অনুমতি নিয়ে বললাম, 'স্যার, আমি এটার আরবি বলবো প্লিজ?' স্যার আচমকা রেগে গিয়ে ধমক দিলেন, 'আবুল কোথাকার! গণিত বোঝে না এক ফোঁটা, আবার পন্ডিতি করে!' চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে মুহূর্তেই চোখ অশ্রুসজল হতে দেখে (আমি ছিঁচকাদুনে ছিলাম কি না) স্যার একটু নরোম গলায় বললেন, 'বলে ফ্যালো।' আমি যখন 'حساب المثلثات' বলছিলাম, তখন সত্যিই গলা ধরে আসছিলো। স্যার বোধহয় মায়া অনুভব করলেন, একটু স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলেন।

'বেশ তো! কিভাবে জানলে?'

আমার মুখ উজ্জ্বল হতে শুরু করলো।

'স্যার, আমি জানতাম, আজকে ত্রিকোণমিতি শুরু হবে। কাল ভাবছিলাম, এটার ইংরেজি তো জানি, আরবি কী তা জানি না। ডিকশনারি থেকে শিখে নিয়েছি।'

ঐ দিনটা ছিলো গণিতের ব্যাপারে আমার টার্নিং পয়েন্ট। ঐ ক্লাসের পরে স্যার ব্যক্তিগতভাবে ডেকে আমাকে অনেকক্ষণ ধরে বুঝিয়েছেন, আউট বই পড়ার সাথে সাথে গণিত প্র্যাকটিসেও সময় দিতে উদ্বুদ্ধ করলেন। সাহস যোগালেন এবং উৎসাহ দিলেন। ক্লাসে খাওয়া তিক্ত ধমক এবং ক্লাসের বাইরে পাওয়া মিষ্ট চমক আমাকে বদলে দিলো। কবিতার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে ফাঁকে ফাঁকে গণিতকেও সময় দিলাম। পরবর্তী পরীক্ষায় ছিয়ানব্বই পেলাম। স্যার ভীষণ ভীষণ খুশি হলেন।

এই আনকোরা গল্পগুলো দিনলিপি-তে লেখা হত না, যদি না লাইব্রেরিতে ঢোকার পরে বন্ধু শফিউল্লাহ-কে পুনরায় বলতাম। আমার ব্যক্তিগত পাঠ-দর্শন এবং পাঠ-পদ্ধতি নিয়ে ও যখন জানতে চাইলো, বিষয়গুলো তুলে ধরলাম। সেই সাথে আরেকটা ব্যাপারেও দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম, যেটা সবসময়ই পরিচিত 'স্টুডেন্ট অব নলেজ'দের বলার চেষ্টা করি; আর তা হোল: অর্জিত জ্ঞান এবং পঠিত বিষয়াদি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে নানা আঙ্গিকে যখন প্রয়োগের চেষ্টা করা হয়, তখন সেটার স্থায়ীত্ব মজবুতি পায়, সেটার টেকসই হবার সম্ভাবনা নিঃশঙ্ক হয়। আমি দেখেছি, একই বিষয়, একই শব্দ কিংবা একই ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অথবা কাছাকাছি যা কিছু পড়েছি বা জেনেছি বা শুনেছি, সবকিছু যখন এক ঝলকে মাথায় এনে ব্রেইনস্টোর্মিং করি, তখনই বোঝা যায়, আমি যা জেনেছি বা পড়েছি তার আবেদন ভেতরে কতখানি আছে। সেখানে কোথাও যদি জং ধরতে দেখা যায়, সেটা পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা যায়। কোথাও পলেস্তরা খসে পড়লে মেরামতের চেষ্টা করা যায়। এভাবে করে জানা বিষয়গুলো নতুন মাত্রা পায়, শক্তভাবে গেঁথে বসে ভেতরে। শফিউল্লাহ-কে আমার প্যাডের পাতাটা দেখালাম, যেটা আমি কুকুরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে লিখেছি। কী লিখেছি সেখানে? কুকুরটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমার মনে যেসব বিষয় উঁকি দিয়েছে, সেসব লিখেছি। সেখান থেকে যেগুলো পুরোপুরি মনে পড়ে গেছে, সেগুলো তো বললাম। আবার অনেকগুলো আমার আবছা মনে আছে, বাসায় এসে দেখে নেয়ার প্রয়োজন আছে। যেমন:

» আমার মনে পড়লো, কুকুর এবং কুকুরের উচ্ছিষ্ট'র হুকম নিয়ে ফিকহে পড়েছি। কিন্তু শারী'আহর বিভিন্ন স্কুল অব থ্যট-এর মধ্যে এতদসংক্রান্ত যে মতপার্থক্য এবং দালীলিক আলোচনা আছে, সে সব আমার স্পষ্টভাবে মনে পড়ছিলো না। ব্যস, আমি নোট করে নিলাম, বাসায় এসে বিভিন্ন ফিকহ গ্রন্থ ঘেঁটে আমি এই বিষয়টা আজ আবার দেখে নেবো।

» আমার আবছা আবছা মনে পড়লো, লর্ড বায়রন-এর একটা কবিতা এবং

রুডয়ার্ড কিপলিং-এর একটা কবিতায় কুকুরের প্রসঙ্গা ছিলো। কিন্তু কোনোটাই আমার ভালো মত স্মরণে আসছিলো না। এটাও আমি টুকে নিলাম। উদ্দেশ্য, স্মরণে আছে যেসব শব্দ বা বাক্য, সেগুলো দিয়ে ঘেঁটে কবিতা সংক্রান্ত সাইটগুলো থেকে কবিতা দুটো উদ্ধার করে পুনর্বার পড়বো।

» কুরআনে আসহাবুল কাহফ-এর ঘটনায় কুকুর-এর প্রসঙ্গা আছে। অথচ আয়াতটা আমার পুরো মনে নেই। এটাও লিখে রাখলাম, তাফসির ঘেঁটে আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাটা আবার যাতে জেনে নিই।

আমার যৎসামান্য পাঠাভিজ্ঞতা বলে, এভাবে যখনই কোনো বিষয় সামনে আসে, সেটার সাথে সম্পর্কিত যা কিছু মনে পড়ে, সেগুলো যখন ভাবি কিংবা পুনর্বার পড়ি, তখন মস্তিষ্কে ভালোভাবে গেঁথে যায়।

শফিউল্লাহ-কে লাইব্রেরির মধ্যেই ক্ষীণস্বরে সেসব কথা বলছিলাম। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, যেটা সে-ও বলেছে, এই যে কৌতূহল এবং জানার স্পৃহা, সেটা তো আগে অর্জন করা চাই! আমি বলি কি, এটা অর্জনের কোনো বিষয়-ই না। এই কৌতূহল-স্পৃহা আমাদের সবার মধ্যেই আছে। কিন্তু আমরা অপাত্রে খরচ করে ফেলি। দৈনিক যত দিকে আমরা কৌতূহল-স্পৃহাকে কাজে লাগাই, দিনশেষে তার সবকিছুই কিন্তু অর্থবহ হয় না। সেই শক্তিটাকে জ্ঞানের কাজে লাগানো গেলে, উদ্ভাবনী স্পৃহা জাগ্রত করার কাজে লাগানো গেলে অর্থপূর্ণ হয়।

গেলবছর একটা ম্যাগাজিনে ফরমায়েশি লেখা প্রস্তুত করার জন্যে পোলিশ ফিজিসিস্ট মেরি কুরি সম্পর্কে পড়তে হয়েছিলো। এই বিদূষী নারী থেকে আমি দারুণ একটা জিনিস শিখেছি। একবার কিছু সাংবাদিক তাঁকে বারবার পারিবারিক বিষয়াদি নিয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন। তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন: be less curious about people and more curious about ideas!

এই একটা ‘থ্রেট’ আমি নিজেকে দৈনিক কয়েকবার দেই।

কথাটা খুব মনে ধরেছিলো আমার। এরপর থেকে যে কারো সাথে কথায় ও আচরণে আমি এটা অনুসরণ করি। নিজেকে বলি, মানুষের এটা ওটা নিয়ে ভেবে সময় অপচয় করে কী লাভ, বরং ঐ কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা নতুন কিছু জানার জন্যে, নতুন কিছু ভাবার জন্যে ব্যয় করা-ই বেশি সঙ্গাত।

আমরা হলের ক্যান্টিনে গিয়ে খেলাম, যোহর সারলাম সেখানেই। লাইব্রেরি তখন প্রায় ফাঁকা হতে শুরু করেছে। কেউ কেউ টেবিলেই মাথা রেখে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আমার চোখ বুঁজে আসে। একটা কবিতা লিখলাম। হাবিজাবি কিসব পড়লাম, বিচ্ছিন্নভাবে। আসর পড়লাম হলে গিয়ে। মাহবুব আনারস খাওয়ালো হলের সামনে। দূরসম্পর্কীয় একজন আত্মীয় এসেছে নতুন সেশনে ভর্তি হতে, হলে গিয়েছিলাম তাঁর সাথে দেখা করতে। সহসা তাঁর দেখা পেলাম না। ফোন করে কালকে দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাঁচটার বাস ধরলাম।

যথারীতি নীড়ে ফেরা সান্ধ্যবিহগ আবারো আপন জগতে মত্ত হোল।

তোমাকে ভালোবাসি না, আম্মু

পড়ছিলাম সুবিখ্যাত ও সমাদৃত গ্রন্থ الورع لابن أبي الدنيا।

একটা গল্প খুব চিন্তা জাগিয়ে দিলো।

এতোদিন নিজের ব্যাপারে একটা আত্মবিশ্বাস ছিলো, আমি আব্বুআম্মুকে অনেক অ-নে-ক ভালোবাসি। মনে হতো, পৃথিবীতে আমিই আব্বুআম্মুকে সবচে' বেশি ভালোবাসি। সম্ভবত আমার ব্যাপারে তাঁদের অবস্থানও তাই। আলহামদুলিল্লাহ। একদম দুধে ধোয়া নই ঠিক, তবুও এই বাড়াবাড়ি রকম অনুভূতিটা প্রশ্রয় পায় উভয়পক্ষের ভালোবাসার সমীকরণ সমান্তরাল বলে।

কিন্তু আজকে ভাবছি, নাহ! এই দাবী মোটেও সত্য নয়। মনে হচ্ছে, হাসান ইবন 'আলীর [রা.] মতো মায়ের প্রতি এতো বেশি গভীর মমতা জড়ানো ভালোবাসা আর কে-ই বা দেখাতে পারে?

ঘটনা হোল, তিনি তাঁর আম্মুর সাথে কখনো খেতে বসতেন না। জিজ্ঞেস করা হোল, 'আপনি এমনটি কেন করছেন?'

দেখুন, কী ছিলো তাঁর জবাব!

'ধরুন, আম্মুর সাথে খেতে বসলাম। এমন সময় কোনো খাবারের দিকে আম্মুর চোখ গেলো এবং সেটা তাঁর পছন্দ হওয়ায় খেতে মন চাইলো, কিন্তু মুখ ফুটে

বললেন না। এমনও হতে পারে, আমি সেটা বেখেয়ালে বুঝতে না পেরে নিজেই খেয়ে ফেললাম। কী হোল এখন! আমি আম্মুর অবাধ্য হয়ে গেলাম না?[১]'

শ্রদ্ধাবোধ এবং ভালোবাসার পরিমাণ কতটুকু হলে কেউ এভাবে ভাবতে পারে?

---

১ গ্রন্থটি আমার সংগ্রহে নেই। মাসজিদ নাবাওয়ির গ্রন্থাগারে বসে পড়েছিলাম। এই গল্পটা নোট করে নিয়েছিলাম, কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কত তম খন্ড কিংবা পৃষ্ঠা নম্বর কত, তা টুকে নেই নি।

আমার আত্মা মরে গেছে

আত্মা মরে যাওয়া। ঈমানের জোর কমে আসা। 'আমালের ঘাটতি। নাফসের সাথে পেরে না ওঠা।

এই কাছাকাছি অনুভূতি-নির্দেশক বাক্যগুলোর সাথে আমরা কমবেশি পরিচিত। একজন মু'মিনের হৃদয়ে যখনই এই ভাবনাটা জাগ্রত হয়, তখন অজানা অস্থিরতা কাজ করে।

'আমি আগের মত নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না কেন?'
'আমার আত্মা আগের মত প্রশান্ত নয় কেন?'
'আমার স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ 'আমালের সোনালি দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেল?'
'আমি এত চাচ্ছি, হৃদয়টা সজীব-সতেজ রাখতে পারছি না কেন?'
'আহা! আমি 'ইবাদাতে তৃপ্তি ও আন্তরিকতা হারিয়ে ফেললাম কিভাবে?'

অনুভূতিটা অনেকটাই Philip James Bailey'র সে কথার মতই:

I cannot love as I have loved,
And yet I know not why;
It is the one great woe of life
To feel all feelings die.[১]

---

১ Festus: A Poem, Page 186

চলুন, কাব্যানুবাদ করে ফেলি:

আগের মতন ভালোবাসতে যে পারছি না আমি হায়!
কেন যে এমন হচ্ছে, কারণ জানি না এখনো তার।
জীবনে আমার এর চেয়ে বড় বিষাদ কি হয় আর?
হৃদয়ের সব অনুভূতি বুঝি মরে গেছে অবেলায়!

হুমম... ঠিক?

মিলে গেলো?

কারণ জানেন না, এই তো?

উমম... না, আপনাকে জানা চাই-ই! না জানলে পরিত্রাণ পাবেন কী করে বলুন?

দেখুন, 'আব্দুল্লাহ ইবন আল-মুবারাক [র.] কী বলছেন:

رأيت الذنوب تميت القلوب

ويتبعها الذل إدمانها

وترك الذنوب حياة القلوب

وخير لنفسك عصيانها[১]

আমরা এটাকেও কাব্যানুবাদের চেষ্টা করি:

আমি দেখলাম, পাপের থাবায় অন্তর হয় মরা;
আত্মগ্লানিও পিছু পিছু তার এসে পড়ে ঠিক তখন।
হৃদয় সজীব হবে তুমি পাপ ছাড়তে পারবে যখন,
তোমার জন্যে কল্যাণ হবে পাপকে দমন করা।

কিসসা খতম!

কাজে নেমে পড়ুন তাইলে!

---

১ জামি' বায়ান আল-'ইলম: ৭২২

রোজনামচার দ্বিতীয় পাঠ

চট্টগ্রাম শহরে যাচ্ছি মাইক্রোবাসে চড়ে। আব্বু এবং ছোট আব্বু সামনের সারিতে, আর আমি ঠিক তার পেছনের সারিতে। আমার পাশে একটি বাচ্চা সহ মাঝবয়সী হিন্দু দম্পতি।

বাচ্চাটা বারবার কেঁদে উঠছিলো, মা তাতে বিরক্ত হচ্ছিলেন। ওদিকে বাচ্চার বাবা অসুস্থ, বোঝা যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম, তাঁরা চিকিৎসার জন্যে যাচ্ছেন। বাম পাশ থেকে যথাক্রমে আমি, বাচ্চার বাবা এবং তারপর বাচ্চা কোলে নিয়ে বাচ্চার মা। আমার ঠিক পেছনে মাদরাসা-পড়ুয়া একজন বড়ো ভাইয়া।

এর মধ্যে হঠাৎ করেই বাচ্চার মা হেল্পারের কাছে পলিথিন চাইলেন। পলিথিন হাতে আসার পর পরই বাচ্চার বাবা বমি করা শুরু করলেন। উনি স্বামীর বুকে হাত রাখতেই বাচ্চাটা আবারও কেঁদে ওঠলো। মহিলা যথেষ্ট বিরক্ত এবং অপ্রস্তুত। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় বাচ্চাটার ওপর অনেকক্ষণ রাগ ঝাড়লেন।

ইতোমধ্যে লোকটা তাঁর স্ত্রীর কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুঁজে থাকলেন। কিছুক্ষণ যেতে না যেতে বাচ্চাটা আবার গলা ফাটিয়ে কান্না শুরু করেছে আর এরই মধ্যে বাচ্চার বাবা আবার বমি করতে শুরু করেছে। মহিলা তো কান্না করবে করবে অবস্থা। আমার করুণা হচ্ছিলো তাঁদের এই অবস্থায়। লোকটার পেছন দিকেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমি মা-কে বললাম, 'আপনি ওনাকে দেখুন, বাচ্চাটা আমার কোলে দিন প্লিজ'। আমার পোষাকের দিকে চেয়ে তাঁরা একটু অপ্রস্তুত-ই হলেন। দেবেন কি দেবেন না এরকম একটা ভাব। কিছুটা সংকোচ কাজ করছে বুঝলাম। আমার দিকে ফিরে চাইতেই উনি মাথায় কাপড় টেনে দিলেন। আবার বললাম,

'আপনি চিন্তা করবেন না, বাচ্চাকে আমি দেখছি, আপনি ওনাকে দেখুন!' এবার অনেকটা নিরুপায় হয়েই দিয়ে দিলেন। আশ্চর্য! আমি কোলে নিতেই বাচ্চাটা শান্ত! ডাগর ডাগর চোখে আমাকে দেখছে! দুইজনের তো খুশির অন্ত নেই! দৃশ্য দেখে বাবাকে মনে হচ্ছে অর্ধেক সুস্থ-ই হয়ে গেছেন! শহরে পৌঁছতে মিনিট বিশেক বাকি। লোকটা তাঁর স্ত্রীর কাঁধেই মাথা রেখে ঝিমুচ্ছেন। মহিলা আমাকে চট্টগ্রামের ভাষায় বললেন, 'দাও বাবা! কান্না তো থামছে।' এবার লোকটা সোজা হয়ে নিজেই আমার কাছ থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে মাকে পাস করে দিলেন। মহিলা চট্টগ্রামের ভাষায় চাপা কণ্ঠে বললেন, 'আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখুক বাপজান!'

এবার পেছনের সারির ভাইয়াটা আমাকে ডাকলেন। গলা উঁচিয়ে বাম পাশ দিয়ে আমার কানের কাছে এসে আস্তে আস্তে বললেন (চট্টগ্রামের ভাষায়), 'ভাইজান, ওরা তো অমুসলমান। আপনি ওদের বাচ্চা নিলেন কেনো?' প্রশ্ন করার ঢঙটা আমার কাছে যথেষ্ট পরিচিত, কিন্তু ঐ মুহূর্তটাতে একটু রাগ হচ্ছিলো তাঁর উপর। মনে মনে বলছি, একজন মানুষ, তার উপর একজন মুসলিম এত্ত অমানবিক হয় কিভাবে? তবুও তার দিকে কোণাকুণি ফিরে হাসলাম। স্বাভাবিক হয়ে বললাম, 'ভাইয়া, কাজটা করতে রাসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।' উত্তরটা বোধহয় ভাইয়ার পছন্দ হয় নি মোটেও। ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'দলিল ছাড়া কথা বলা আমি পছন্দ করি না।'

আমি আবারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুচকি হাসলাম। এতক্ষণে আমার ধারণা সত্যি হোল। কারণ, আমি আগের উত্তরটা দেওয়ার আগে 'প্র্যাকটিক্যাল দাওয়াহর ফিকহ' নিয়ে কিছু বলতে চাচ্ছিলাম। উনি যেহেতু প্রশ্নের ক্ষেত্রে স্পর্শকাতর, বুঝলাম প্যাঁচ লাগবে। সুতরাং সরাসরি হাদিসের টেক্সটকেই 'স্ট্যান্ড পয়েন্ট' ধরলাম। দলিল শুনতে চাওয়ায় আমি তাই পরক্ষণেই কিছুটা হাল্কা বোধ করলাম। হাদিসটা মুখস্থই ছিলো (রাওয়ীর নাম তখন মুখস্থ ছিলো না)। তাঁকে শোনালাম:

“

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: 'দয়াশীলদেরকে দয়াময় (আল্লাহ) দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীতে যারা আছে, তাঁদের প্রতি দয়া করো; তাহলে আসমানে

যিনি আছেন, তিনি তোমাদের দয়া করবেন।[১]

হাদিসটা ভাইয়ার পরিচিত ছিলো, পড়ার সময় অর্ধেক যেতে না যেতেই আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'এইখানে কোথায় আছে যে একটা হিন্দু ছেলেকে কোলে নিতে হবে?'

আমি তাঁর 'কমন সেন্স'র অভাবে নিজেই কষ্ট পাচ্ছিলাম। খুব সংক্ষেপে বোঝাতে চাইলাম, দেখুন ভাইয়া, হাদিসের শব্দগুলো হচ্ছে ارحموا من في الأرض [তোমরা পৃথিবীতে যারা আছে, তাঁদের প্রতি দয়া করো; (এক কথায় পৃথিবীবাসী)], এখন আমাকে বলুন, পৃথিবীতে কি শুধু মুসলমানই থাকে, না অন্য ধর্মের লোকও থাকে? এই হাদিস তো আমাকে বলছে স্বাভাবিক অবস্থায় বিপদে আপতিত যে কোন মানুষের পাশেই দাঁড়াতে! যদি শুধু মুসলমানের প্রতিই দয়া করার কথা বলা হতো, তাহলে নবীজি 'মুসলিমদের দয়া করো' বলতেন, 'পৃথিবীতে যারা আছে' বলে সব মানুষকেই, উপরন্তু সব সৃষ্টজীবকে অন্তর্ভূক্ত করতেন না।

যতটুকু স্পর্শকাতর ভেবেছিলাম তাঁর প্রশ্নে, এবার দেখলাম তেমনটি নয়। মা শা-আল্লাহ, তিনি বুঝতে পারলেন এবং সুন্দর ভাবেই মেনে নিলেন।

এখান থেকে আরেকটা বিষয় আমার কাছে প্রত্যক্ষভাবে পষ্ট হোল, দাওয়াহর ফিকহ কেবল অমুসলিম অথবা অনুশীলনবিমুখ মুসলিমদের জন্যেই নয়; অনুশীলনরত (practicing) কারো বদ্ধমূল ধারণার বিপরীতে কোন মত উপস্থাপন করা কিংবা ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রেও ঠান্ডা মাথায় সহনশীল ও প্রাজ্ঞ আচরণের প্রয়োজন।

---

১ সুনান আত-তিরমিযী: ১৯৮৭

একদিন আসবে আলো

হোস্টেল থেকে খুব একটা বের হই না। আসরের পর মাঝে মাঝে ঝোঁকের বশে বেরিয়ে পড়ি। একাকী কদ্দূর হাঁটি। আনমনে। কয়েকটা 'পথশিশু'কে সাথে নিয়ে পেঁয়াজু আর বেগুনি খাই। ওদের সাথে কথা বলি। ওদের স্বপ্নের রাজ্যে কল্পের ডানা মেলে উড়ি। মাথায় হাত রাখার পর তাদের সকৃতজ্ঞ হাসিতে ঝরে পড়া মুক্তোগুলো নিয়ে তৃপ্তির মালা গেঁথে নিজের গলায় ঝুলিয়ে আবার চলে আসি আপন নীড়ে।

আজকের দৃশ্যটা ভিন্ন ছিল। ছেলেটা বেশ চটপটে। কিন্তু ঝামেলা বাঁধালো একটা। ও কেনো জানি ভেবে নিয়েছে, আমার এই ক্ষুদ্র ভালোবাসা ওর জন্যে করুণার কিছু। এই ধরনের পরিস্থিতিকে সব সময়ই ভয় করি। খুব চেষ্টা করি কেউ যেন আমার প্রতি বেশি কৃতজ্ঞ না হয়ে যায়। ভালোবাসা পেয়ে হাসিমাখা মুখে একটা 'পোজ' দেবে, আরশের মালিক ছবিটা ক্লিক করে রাখবেন, তারপর সে আমাকে ভুলে যাবে — আমার কথা ও আচরণে এই দর্শনটা প্রয়োগ করার চেষ্টা করি। এই ছেলে পুরো ব্যতিক্রম। বয়সের তুলনায় চিন্তাশক্তি এবং বাগভঙ্গিতে পরিপক্কতার ছাপ। মায়াবী চাহনিতে ও আমাকে বেশ কিছু বলে ফেললো ইতোমধ্যে। দুই গালে হাত দিয়ে পাগল ছেলেটাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, এ আমার করুণা নয়, এ তো তার প্রাপ্য অধিকার!

এই পরিস্থিতিগুলোতে 'উমার ইবন আল-খাত্তাবকে [রা.] মনে পড়ে খুব। বায়তুলমাল থেকে তিনি নির্ধারিত অংশ বণ্টন করছিলেন সবার মাঝে। খুশিতে কয়েকজন বললো: جزاك الله خيرًا يا أمير المؤمنين

'আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।'

'উমার বললেন: ما بالهم نعطيهم حقهم ويظنونه مني منة عليه!

'কী অবস্থা এদের! আমি তাদের প্রাপ্য অধিকার তাদেরকে দিচ্ছি, আর তারা কি-না ভাবছে, এটা আমার করুণা![1]'

এই শিশুগুলোকে নিয়ে কত্তো স্বপ্ন আমার! কিন্তু সাধ ও সাধ্যের বড়ো বেশি ব্যবধান আমার।

খুব ভাবি, একদিন এরা নিজেদের অধিকার নিজেরা চিনে নেবে। কিন্তু কে চেনাবে ওদের? একজন 'উমার কি ফের আসবে পৃথিবীর বুকে?

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি। আনমনে হাঁটতে থাকি। চোখেমুখে ভালোলাগা ও ভালোবাসারা ঝিকিমিকি করছে। হাঁটতে হাঁটতে কখন যে মুখে গানের কলিটা চলে এসেছে টের-ই পাই নি: 'প্রভু তুমি বলেছো রাসূল দেবে না, বলো নি দেবে না ওমর...'

---

১ মাদীনাহর মাসজিদ কুবা-তে একদিন জুমু'আহর খুতবায় সম্মানিত খতিব এই কথোপকথনটির কথা বলেছিলেন। আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্যসূত্র জানা নেই।

বিড়ালওয়ালার গল্প

গল্পটা আবূ হুরায়রার। প্রিয়নবীজির [ﷺ] প্রিয় সাহাবী আবূ হুরায়রা।[১] ইনি পিচ্চি ছেলে-মেয়েদের দেখলে আদর করে আগে কাছে টেনে নিতেন। তারপর গল্পের ছলে তাদেরকে শিখিয়ে দিতেন একটি দু'আ। ওরাও তখন বেশ আগ্রহ নিয়ে দু'আটি পড়তো। আবূ হুরায়রা মনে মনে খুশি হতেন।

কী সেই দু'আ?

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ 'আল্লাহুম্মাগফির লি-আবি হুরায়রা[২]'

মানে হোল: 'হে আল্লাহ! আপনি আবূ হুরায়রাকে ক্ষমা করুন।'

---

১ অনেকেই 'আবু হুরায়রা'র বাঙলায়ন করেন 'বিড়ালছানার পিতা' বলে, যা অযৌক্তিক ও অবাস্তব। আরবিতে أَب শব্দটি শুধু 'পিতা' অর্থেই ব্যবহৃত হয় না, এই শব্দটি ক্ষেত্রবিশেষে 'মালিক', 'পথিকৃৎ', 'চাচা', 'দাদা' ইত্যাদি অর্থও দেয়। [দ্রষ্টব্য: আল-মু'জাম আল-ওয়াসীত্]
স্থান-কাল-পাত্র ভেদে শব্দের উপযুক্ত অর্থটি বেছে নিতে হবে। যেমন: أبو المال (আবুল মাল) এর অর্থ 'সম্পদের পিতা' নয়, বরং 'সম্পদশালী'।
আবূ হুরায়রা (মূল নাম 'আবদুর রাহমান) বিড়ালছানা অত্যধিক পছন্দ করতেন এবং তাঁর জামার আস্তিনেও মাঝেমধ্যে বিড়ালছানার দেখা মিলত বলে রাসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁকে أبو هريرة বলে সম্বোধন করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে 'বিড়ালছানার মালিক'। অথবা প্রেক্ষিত বিচারে আরেকটু মানানসই অনুবাদ যদি করতে হয়, বলা যেতে পারে, 'বিড়ালওয়ালা'। কিন্তু 'বিড়ালছানার পিতা' অনুবাদটি অগ্রহণযোগ্য। والله أعلم

২ জামি'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম, খ. ৪২ পৃ. ১৭।

আবূ হুরায়রা তখন তাদের সাথে সমস্বরে বলতেন: আ-মীন।

একই কাজ করতেন 'উমার ইবনুল খাত্তাব। ইনিও মিষ্টি ভাষায় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছে নিজের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার দু'আ করতে আবদার জানাতেন একইভাবে। বলতেন, 'তোমরা তো কখনো পাপে জড়াও নি![১]'

অবাকই হতে হয়, শুদ্ধতার শুভ্র চাদরে ঢাকা যাঁদের রাত ও দিনের প্রতিটি ক্ষণ-তাঁরা কতোটা না ব্যাকুল এবং উদগ্রীব ছিলেন নিজের ব্যাপারে! নিজের ভুল আর অসঙ্গতির জন্যে আল্লাহর কাছে অনুক্ষণ অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমার আকুতি তো জানাতেন-ই, এর বাইরেও তাঁদের ধ্যান আর চিন্তায় কেবলই ছিলো ক্ষমাপ্রাপ্তির অন্যান্য অনুষঙ্গ অনুসন্ধানের আবেগ ও আকুলতা! আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্যে কত অভিনব (শারী'আহ-সমর্থিত) পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়, তার সবই তাঁরা করেছেন।

এই যে দেখুন, কিছু পিচ্চি-পাচ্চাকে সামনে পেলেন তাঁরা। পেয়েই তাঁদের মনে প্রথমে কোন্ ভাবনার উদয় হোল? তাঁদের চিন্তায় আসলো, এই শিশুরা এখনো পাপ-কদর্যতার জটিল অঙ্ক কষে নি, আল্লাহর অবাধ্যতা করতে শেখে নি। এখনো পর্যন্ত নিষ্পাপ ও পরিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী এই ছোট্ট মানুষগুলো যদি আল্লাহর কাছে কোনো আবদার জানায়, আল্লাহ সেটা হয়তো বিশেষভাবে শুনবেন, এমন প্রণোদনা থেকেই তাঁরা শিশুদের মাধ্যমে ইস্তিগফারের দু'আ করিয়ে নিতেন।

আল্লাহর ক্ষমা পাবার জন্যে সেই ব্যাকুলতা কি আমাদের আছে? শুনলে অবাক হবেন, আল্লাহর রাসূল [ﷺ] দৈনিক একশোবার 'তাওবাহ' করতেন![২] আমরা একশোদিনে একবার করি তো!? অথবচ তাওবাহর প্রয়োজনীয়তা, ক্ষমাপ্রার্থনার জরুরত আমাদেরই বেশি!

আল-হারাম লাইব্রেরিতে গল্পটা পড়েছি দেশে ফিরে আসার একদিন আগে। তাড়াতাড়ি গিয়ে মেজো আব্বুর দুই জান্নাতী প্রজাপতি সুহাইমা এবং সাহিমকে পাশে বসিয়ে শিখিয়ে দিলাম বাক্যটা, আবূ হুরায়রার জায়গায় আমার নাম বসিয়ে।

(আল্লাহুম্মাগফির লি-নাজীব)

---

১ প্রাগুক্ত।

২ সাহীহ মুসলিম: ৮৭০২

ক'দিন আগে মেজো আম্মু ফোন করে জানিয়েছেন, ওরা ইতোমধ্যে এই দু'আ তাদের বাবা এবং মামণিকেও শিখিয়ে ছেড়েছে! এই অপার্থিব আনন্দের সত্যিই তুলনা নেই।

আপনি ইচ্ছে করলে আশেপাশের কাচ্চা-বাচ্চাদের সাথে নিয়ে বসুন। একটা ভালো চকলেট দিয়ে শূন্যস্থানে আপনার নাম বসিয়ে পড়িয়ে নিতে পারেন:

'আল্লাহুম্মাগফির লি-.........'

আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন!

খুনসুটির গল্প

দাম্পত্যজীবনে উভয়ের ভালোবাসার অনুভবকে অজস্রধার করার জন্যে খুনসুটির প্রয়োজন আছে। পারস্পরিক বোঝাপড়াকে একঘেঁয়েমির মরচে থেকে রক্ষা করার জন্যে মাঝেমধ্যে উপাদেয় বাক্যবিনিময় বেশ কাজে দেয়।

সর্বোত্তম আদর্শের মূর্ত প্রতীক রাসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর দাম্পত্যজীবনও ছিলো প্রীতিময়, প্রাণোচ্ছ্বল ও সবুজ-সজীব।

একবার নবীজি [ﷺ] 'আয়িশার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা দিলেন। সেবার 'আয়িশা বিজয়ী হলেন।

আরেকবার প্রতিযোগিতা দিয়ে 'আয়িশাকে পেছনে ফেলে দিলেন এবং বললেন, 'শোনো, এটা ঐদিনের প্রতিশোধ!'

এই গল্প সীরাতের পাতায় পড়েছি বেশিদিন হয় নি। গতকাল আমার এক (মিশরীয়) কবিতা-বন্ধু তাঁর ফেসবুকে 'প্রোফাইল পিকচার' পরিবর্তন করেছেন। আমি কিছু একটা লিখতে যাবো, তার আগেই দেখি তাঁর সহধর্মিণী 'কমেন্ট' লিখে বসে আছেন:

!أنت مثل القمر

(তুমি চাঁদের মতো!)

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তিনি সেই 'কমেন্ট'-এর 'রিপ্লাই' লিখলেন:

!القمر يأخذ منك نوره يا شمس

(চাঁদ তো তোমার কাছ থেকেই আলো নেয়, হে সূর্য)

ফিরদাউসের ফুলবাগানে আমি হবো পাখি

এক

: পাহাড় দেখেছেন নিশ্চয়-ই?

: জি!

: মস্ত পাহলোয়ান হিসেবে চার গ্রামে আপনার তো বেশ নামডাক আছে।

: হেহেহ জি!

: আচ্ছা ধরুন, আপনার মতো এরকম কয়েক শো পাহলোয়ান একসাথে হয়ে যদি পাহাড়টা ঠেলতে থাকেন, পাহাড় কি তার জায়গা থেকে এক ইঞ্চি নড়বে?

: দুনিয়ার কোন পাগলটা আছে, যে বলপ্রয়োগে পাহাড় সরাতে চাইবে?

: আছে রে ভাই! সেই গল্পই তো শোনাবো!

দুই

: এই নুড়িকণাগুলো যদি আপনাকে এখান থেকে সরাতে বলি, পারবেন?

: হাসালেন ভাই!

: মানে পারবেন, এই তো?

: মিয়াভাই হাসায়েন না আর! এইটা কি জিজ্ঞাসা করার বিষয়? নুড়ি পাথর সরাতে

আমার মত পাহলোয়ানের কী দরকার? একটা ছোট বাচ্চা-ও এটা পারবে। তা বলেন, আপনি হঠাৎ এই প্রশ্ন করছেন কেনো?

: কাহিনী আছে! শোনাবো তো!

তিন

: পাহলোয়ান ভাই, একটা জিনিস ভাবছিলাম।

: কী মিয়াভাই?

: এই যে পাহাড়টা! এটা ছোট ছোট কিছু নুড়িপাথর, বালুকণা আর মাটি মিলে এত বড় হয়েছে, তাই না?

: হুমম।

: দেখেন, এই ছোটখাট পাথর আর মাটিকণা এখান থেকে আপনি অনায়াসেই সরাতে পারবেন। কিন্তু এরা জমতে জমতে যখন পাহাড়ের রূপ নেবে, তখন কিন্তু সরাতে পারবেন না!

: ঠিক বলছেন মিয়াভাই। ছোটবেলায় ইশকুলে মাস্টার মশাই পড়িয়েছিলেন:

"ছোট ছোট বালুকার কণা, বিন্দু বিন্দু জল

গড়ে তোলে মহাদেশ, সাগর অতল!"

: আরিব্বাস সে কথা-ই তো বলছিলাম। তা পাহলোয়ান ভাই, আমি আরেকটা কবিতা শোনাতে চাই আপনাকে।

: নিশ্চয় নিশ্চয়!

: আমার কবিতাটা কিন্তু আরবিতে। ইবনুল মু'তাজের লেখা। তাফসির ইবন কাসির- এর নাম শুনেছেন না? ঐটাতে পড়লাম।

: আমি তো আরবি বুঝি না মিয়াভাই!

: চিন্তা করিয়েন না। আমি কাব্যানুবাদ করে দেবো তো!

: বাব্বাহ! বলে ফেলেন তাইলে!

: শোনেন মন দিয়ে:

خل الذنوب صغيرها * وكبيرها ذاك التقى

لا تحقرن صغيرة أن * الجبال من الحصى[১]

ছোট হোক বড় হোক, পাপ ছেড়ে দাও
এরই নাম তাকওয়া, মনে গেঁথে নাও!
'ছোট পাপ' বলে কিছু অবহেলা নয়,
ছোট নুড়িকণা মিলেই পর্বত হয়!

চার

কবিতাটা শুনে পাহলোয়ান ভাই চিন্তায় পড়ে গেলেন। তাঁর চোখে কিছু আপন মানুষের চেহারা ভাসতে লাগলো, যাঁরা 'ছোটখাট পাপ' বলে অনেক বিষয়কেই তুচ্ছজ্ঞান করেন এবং অবলীলায় সেই গর্হিত কাজগুলো করে যান। অথচ তাঁরা খেয়াল করেন না, ছোট ছোট বালুকণার কণা জমতে জমতে পাহাড় হয়! তাঁরা বুঝেন না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু মিলে মহাসাগর হয়!

তাঁর মনে পড়ে, এরকম একজন ভাইকে যখন তিনি উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন ভাইটা জবাব দিয়েছিলেন, 'আরেহ! আল্লাহর রহমতে আমার ঈমান বেশ মজবুত আছে। এসব ছোটখাট বিষয় আমার ওপর বড় একটা প্রভাব ফেলবে না!'

পাহলোয়ান ভাই কিছু বলতে পারেন নি তাঁকে। কিন্তু এখন তাঁকে পুরো বিষয়টা বুঝিয়ে বলতে পারবেন। কী বলবেন? মনে মনে সাজাচ্ছিলেন কথাগুলো।

মিয়াভাই যখন আমাকে নুড়িপাথরগুলো সরাতে বললেন, তখন আমার হাসি পাচ্ছিলো। কিন্তু যখন পাহাড় সরাতে বললেন, তখন আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। এই নুড়িপাথরগুলো মিলেই যে পাহাড়ের সৃষ্টি, সেই পাহাড় কি না আমি সরানোর সাহস করছি না! আমার মত এত বড় পাহলোয়ান যেমন পাহাড়টা সরাতে অক্ষম, তেমনি তোমার মত শক্তিশালী ঈমানদার-ও ছোট ছোট পাপ থেকে সৃষ্ট পাহাড়টা সরাতে অক্ষম!

ভাইটা নিশ্চয়-ই বুঝবে। তারপর হয়তো তাকে প্রশ্ন করবে, 'তাহলে কী করা

১ তাফসীর ইবন কাসীর, খ. ২ পৃ. ২১

যায়?'

পাহলোয়ান ভাই সেটার উত্তর-ও রেডি করে রেখেছে, 'কিছু করতে হবে না। একটাই কাজ তোমার। ছোট পাপ বলে কোনো কিছুকে অবিরত ও চলমান হতে দেবে না। ছোট নুড়িপাথরটা যেমন অনায়াসে সরানো যায়, তোমার পাপটাও সেভাবে খুব সহজেই মুছে ফেলতে পারো। কিন্তু যদি অনবরত করতেই থাকো, তাহলে বিরাট পাহাড়ের আকার ধারণ করবে, তুমি বিপদে পড়ে যাবা।'

ভাইটার মুখে বোধের দ্যুতি ঔজ্জ্বল্য নিয়ে আসবে। নিজের ভুল বুঝতে পারবে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, পাহলোয়ান ভাইকে-ও কৃতজ্ঞতা ও দু'আ জানাবে! এসব ভাবতে ভাবতে পাহলোয়ান ভাইয়ের চোখেমুখে তৃপ্তির রেখা ফুটে ওঠে। মিয়াভাইকে সেই আনন্দে অংশীদার করে।

পাঁচ

পাহলোয়ান ভাইয়ের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ আবার খলখল করে ওঠে :

: আচ্ছা মিয়াভাই, কবিতায় যে তাকওয়ার কথা শুনলাম, এটা নিয়ে কিছু বললেন না তো!

: হুমম! এই যে আমরা ছোট বড় সব পাপ থেকেই সরে আসবো বলে যে প্রতিজ্ঞা করছি, তাকওয়া সেই প্রাণনাকে বাড়ানোর-ই একটি উপাদান!

: বেশ মজার তো! ক্যামনে বলুন তো মিয়াভাই!

: আমার মুখে শুনবেন? নাকি গল্প বলবো একটা?

: তা আর বলতে হয়? গল্প-ই না হয় শোনান!

: একদিন 'উমার [রা.] উবাই ইবন কা'ব [রা.]-কে জিজ্ঞেস করলেন: 'তাকওয়া কী?'

উবাই বললেন, 'আপনি কি এমন পথ দিয়ে হেঁটেছেন, যেটার দুপাশ কণ্টকাকীর্ণ?'

'উমার বললেন, 'হেঁটেছি বটে!'

উবাই জিজ্ঞেস করলেন, 'তখন কী করেছেন আপনি?'

'উমার জবাব দিলেন, 'কাপড় গুটিয়ে খুব সাবধানে সন্তর্পণে হেঁটেছি।'

উবাই বললেন, 'এটাই হচ্ছে তাক্বওয়া![১]'

---

১ প্রাগুক্ত

ছয়

পাহলোয়ান ভাই তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন। কত চমৎকারভাবে তাঁকে বোঝালেন মিয়াভাই!

এবার তো তার দায়িত্ব বেড়ে গেলো। সবাইকে তিনি বোঝাবেন। পৃথিবীর কন্টকাকীর্ণ পথে আমরা যাঁরা জান্নাতের স্বপ্নচারী মুসাফির, তাঁদেরকে কত না সন্তর্পণে, সাবধানে হাঁটতে হবে! আবার ছোটখাট ভ্রান্তিবিলাস থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কি আপ্রাণ চেষ্টা-ই না করতে হবে! নইলে যে পাহাড় জমে যাবে!

পাহলোয়ান ভাইয়ের ভাবান্তর দেখে মিয়াভাই হাসেন, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হন। দুজনের চোখেমুখে স্বপ্নের লুকোচুরি! কদিন আগে নজীব নামের একটা পাগল তাঁদেরকে দোপদী ছড়া শুনিয়েছিলো। এবার সেটাই দুজনের মুখে গুণগুণ রবে গুঞ্জরিত হয়:

"বুকের খাতায় খুব যতনে
একটা স্বপন আঁকি,
ফিরদাউসের ফুল বাগানে
আমি হবো পাখি।"

পাহলোয়ান ভাই খুব ভাবেন, কাজটা খুব কঠিন কিন্তু নয়! স্বপ্নের সাথে একটু সাহস আর ঈমানের রোশনাই জড়িয়ে নিলেই হয়! মিয়াভাই একমত হন। দুজন নতুন শপথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। বদলে যাবার, বদলে দেবার অনুপ্রেরণায় সিক্ত হন।

আমি, আপনি, তুমি, তুই — আমরা কেন বঞ্চিত থাকবো বলেন? পাহলোয়ান ভাই আর মিয়াভাইয়ের মত আমরাও কি নিজেদের সাথে একটু কথা বলতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি!

একঝাঁক পাখি এবং অনন্য আল-কুরআন

একঝাঁক পাখি আকাশে উড়ে যেতে দেখেছেন নিশ্চয়ই! খেয়াল করে দেখবেন, উড়তে উড়তে এক সময় হঠাৎ করেই কিন্তু তাদের পাখা স্থির হয়ে যায়। কিন্তু সেটা ক্ষণস্থায়ী। কিছু সময় পাখা ওভাবে স্থির রেখে এরপর আবার পূর্ণোদ্যমে উড়তে শুরু করে।

এবার আল-কুরআনের মজার ভাষাশৈলী লক্ষ্য করুন।

প্রথমত দুটো বিষয় একটু মাথায় রাখুন:

» পাখির ডানা মেলে উড়ে যাওয়াটা চলমান থাকে।
» ডানা স্থির করে রাখাটা সামান্য সময়ের জন্যে, অস্থায়ী।

এবার আরবি ব্যাকরণের দুটি অনুসিদ্ধান্ত দেখুন:

» আরবিতে فعل (ফে'ল তথা ক্রিয়া) গুলো حدوث (সাময়িক সংঘটিত হওয়া) অর্থে ব্যবহৃত হয়।

» আর اسم (ইসম; যেমন: فاعل তথা কর্তা, مفعول তথা কর্মকারক ইত্যাদি)গুলো আসে প্রবহমানতা অর্থে, অর্থাৎ চলমান প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে।

'ক্লিয়ার?'

এখন আসুন আল-কুরআনের একটি আয়াতের দিকে:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

"তারা কি তাদের উপরে পাখির দিকে তাকায় না? (যারা) উড়ন্ত এবং ডানা সংকোচন করে।[১]"

খেয়াল করে দেখুন:

صَافَّاتٍ শব্দটি একটি ইসম। অর্থ: উড়ন্ত।

[ক্রিয়া ব্যবহার করে 'উড়ে' বলা হয়নি]

يَقْبِضْنَ শব্দটি একটি ফে'ল। অর্থ: ডানা সঙ্কোচন করে।

[ইসম ব্যবহার করে 'সঙ্কোচনকারী' বলা হয় নি।]

সাধারণত, ভাষালঙ্কারের দাবী হোল, একইসাথে দুই ধরনের শব্দ ব্যবহার না করা। পাশাপাশি ভিন্ন দুটি প্রকৃতির শব্দ সাধারণ দৃষ্টিতে বেমানান। আপাতত মনে হতে পারে, এখানে দুটিই ইসম অথবা দুটিই ফে'ল আসলে আরো শ্রুতিমধুর হতো। যেমন:

- যারা উড়ে যায় এবং ডানা সংকোচন করে।

অথবা,

- যারা উড়ন্ত এবং ডানা সংকোচনকারী।

কিন্তু বলা হোল: "যারা উড়ন্ত এবং ডানা সংকোচন করে।" একটি বিশেষ্য, আরেকটি ক্রিয়া।

আমাদের আগের সমীকরণ দুটির দিকে এবার তাকান। রহস্যটা বুঝতে পারলেন?

পাখিদের উড়াটা যেহেতু প্রবহমান থাকে, এজন্যে উড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ইসম। আর ডানা সংকোচন করাটা যেহেতু অস্থায়ী ও অকস্মাৎ ঘটে থাকে, এ জন্যে সে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ফে'ল।

কত সূক্ষ্ম শব্দচয়ন! মহাজ্ঞানী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার শব্দ চয়ন এতটাই বাস্তবসম্মত! আল-কুরআনের এই অনন্য ভাষাশৈলী আমাকে বারবার প্রভুর প্রতি বিনীত মস্তককে আরো বেশি নুইয়ে দেয়।

---

১ সূরা আল-মুলক ৬৭:১৯

সপ্তাহান্তের দিনলিপি

'উইকেন্ড' নামে একটা কিছু আমার জীবনে ছিলো। ছোটভাইকে ঢাকায় আনার পর সেটা তাকে দিয়ে দিয়েছি।

ওদের এই বয়সটা সম্ভাবনার। জীবনের 'টার্নিং পয়েন্ট', আক্ষরিক অর্থেই। পরিচর্যার প্রয়োজন হয়, সহমর্মিতার দরকার হয়। বড়োদের ইতিবাচক সঙ্গ ও প্রীতিযাচক সাহচর্য হয়ে ওঠে অনিবার্য। হোস্টেল থেকে আনলাম আমার কাছে। ঘুরতে বেরোতে মনস্থির করলাম। বইয়ে যেসব বিখ্যাত স্থান ও স্থাপনার কথা পড়ে এসেছে সেগুলো দেখার ইচ্ছে আছে তার।

আমার হাতে নাসিমের হাত। আমি শক্ত করে ধরে থাকি। আমি পাগলটা যে একেবারে অকাজের না, আমি যে এই মুহূর্তে তার নির্ভরতা, আমাকে ওর 'বড়ো ভাইয়া' বলাটাও যে একদম অর্থহীন না, এই কথা ওর ভেতর গেঁথে দেওয়া দরকার বলে মনে হচ্ছিলো। গ্রামীণ সবুজতা পেছনে ফেলে এই নাগরিক কোলাহলে যেন নিজেকে একা না ভাবতে পারে, সেজন্যে এই প্রচেষ্টা। পিঠে ও কাঁধে হাত রাখি। মাথাটা একটু বুকে মিশাই। আল্লাহকে খুব করে বলি, আমার ভাইবোনগুলো এই সরোবরে একেকটা চলিষ্ণু পাথর হোক, কালজ জলজ শ্যাওলা যার গায়ে জমে থাকার সুযোগ পায় না। ওকে ছুঁয়ে দেওয়ার পর আমার অন্তর আজকেও সেই কথাটাই বলছিলো নীরবে।

দৈহিক গড়নে সে সহপাঠীদের তুলনায় ক্ষীণকায় রয়ে গেছে। ভেতরের সত্তাটাও এখনো পুরোপুরি জাগে নি। ও এখন কোন্ পৃথিবীর বাসিন্দা, পুরোপুরি ঠাওর করতে

পারে নি। সবকিছু মানিয়ে নিতে যে বেগ পোহাতে হয়, আধো আধো অনুযোগে সে কথা প্রকাশিত হয়। আমি তাকে অভয় দেই। ক্ষীণকায় বলে নিজেকে দুর্বল না ভাবার জন্যে প্রাণিত করি। একটু মজা করেই বোঝাতে চেষ্টা করি: উনিশ শতকে প্রচণ্ড দুর্বল অর্থনীতির জন্যে যেই চীন-কে 'সিক ম্যান অব এশিয়া' (এশিয়ার রোগাপটকা ব্যক্তি) বলা হতো, সেই চীন এখন উপহাসকারীদের অর্থনীতির ওপরেই ছড়ি ঘোরায়। যেই তুরস্ক-কে 'সিক ম্যান অব ইউরোপ' বলা হতো, সেই রাষ্ট্রটির অগ্রগতি এখন বিশ্ব-অর্থনীতির সরফরাজদের তাক লাগিয়ে দেয়। আরো নানা কথা-উপকথায় মেওয়া ফললো। ওর মুখে এক চিলতে হাসি আসি আসি করে। আর আমার মুখে হাসি এসেই পড়ে। প্রশান্তির হাসি।

আব্বুম্মু'র কথা আমি নিজেই তুলি। পিচ্চি-পাচ্চাদের গপ্পো-ও করে যাই কিছুক্ষণ। ও খানিকটা সময় উদাস হয়ে যায়। এই উদাস হওয়াটা আমার প্রতীক্ষিত ছিলো। সদ্য শৈশব পার হওয়া একটা কিশোর মধ্যবিত্ত পরিবারের সংগ্রামী জীবনাচারের মধ্যে বেড়ে উঠেও ঠিক বুঝবে না কতটুকু রক্ত পানি করে আব্বুরা এই লড়াইয়ে মগ্ন থাকেন। কিংবা উদয়াস্ত খাটুনিতে সংসার কিভাবে আম্মু আগলে রাখেন, সেটাও তার উপলব্ধির আয়নায় পূর্ণরূপে বিম্বিত হওয়ার কথা নয়। আমিও সেদিকে ওর নজর কাড়তে চাই নি। আমি শুধু বুঝিয়ে দিতে চেয়েছি, নাড়িছেঁড়া ধন সুদূর বিয়াবানে পাঠিয়ে আব্বুম্মু ঠিক কী স্বপ্নটা আঁকেন মনের খাতায়। জঠরে ধারণের সময় থেকে ছোট্ট জীবনের এই প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছাতে আমার আম্মু কত ব্যথা পেয়েছেন, শৈশব থেকে তারুণ্য অবধি আমাকে ছায়া দিতে কত রোদ আব্বু সয়েছেন, আমি সেসবকিছু আনমনে ভাবি, পুরোটা না বুঝলেও যৎকিঞ্চিৎ বুঝি। আর তাতেই আমি অশ্রুসজল হই। আমার ভেতরে কেউ একজন বলে, এই ঋণ শোধ না করে পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ো না নজীব! আমি সবসময় এমন কোনো উপায়ের সন্ধানে ছিলাম, যেটা সাধ্যের মধ্যেই সর্বোচ্চ ঋণ পরিশোধ বলে প্রতীয়মান হবে আমার কাছে। একদিন হাদিসে জানলাম:

"

من قرأ القرآن ، وعمل بما فيه ألبس والده يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس

যে কুরআন পাঠ করবে, কুরআনের বার্তা অনুযায়ী আমল করবে, কিয়ামতের দিন তার বাবা-মাকে একটি মুকুট পরিয়ে দেওয়া হবে, যার দীপ্তি হবে সূর্যালোকের চেয়েও উজ্জ্বল।[১]

---

১ আল-মুসতাদরাক: ২১৩১। هذا حديث صحيح الإسناد

হাদিসটা আমাকে অনেকক্ষণ ভাবিয়েছিলো। এই ভাবনা থেকেই আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিয়েছিলাম। আমার ভেতরে উপলব্ধি জেগেছিলো যে, আমার কাজের কারণে যদি আল্লাহ আমার আব্বুম্মু-কে সম্মানিত করেন, সন্তান হিসেবে তাঁদের জন্যে এরচেয়ে বড়ো উপহার আর কী দিতে পারি আমি? কুরআনের সাথে আমার নিবিড় ভালোবাসার কারণে যদি আব্বুম্মুকে চূড়ান্ত হিসেবের দিন মুকুট পরিয়ে দেওয়া হয়, ঋণ পরিশোধের এর চে' উত্তম কোন পন্থা আর কী হতে পারে?

অবশ্য এটা ঠিক, তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য। এই কথাটা এক সময় আবেগের ছিলো, কিন্তু এখন উপলব্ধির। আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাঁদের ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া। তবে এতকিছু ভাবছি কেন? এই গোলক ধাঁধা থেকে বাঁচালেন সুধীন দত্ত। তাঁর কোনো এক লেখায় একদিন পড়লাম, "ঋণ পরিশোধের চেষ্টা এ নয়, ঋণ স্বীকারের দুঃসাহস মাত্র!"

আমিও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, এ আমার ঋণ স্বীকারের দুঃসাহস।

ছোটভাইকে বোঝাই সেসব উপলব্ধির কথা। কুরআন পড়তে জানো মানে একটা সিঁড়ি তুমি অতিক্রম করে ফেলেছো। এবার সেখান থেকে শিক্ষা নিতে পারার মত জ্ঞান অর্জন করা চাই, চাই সেই প্রত্যাদেশ জীবনে প্রয়োগের মত যোগ্যতা। আল্লাহর ইচ্ছায় তোমার নিজের জীবন তো ফুল্ল-ফুলেল হবেই, আব্বুম্মু-ও তোমার কৃতিত্বের হাসিতে হাসবেন। সেই হাসিতে মুক্তো ঝরবে। সেই মুক্তো দিয়ে মালা গাঁথা হবে। আমরা সব ভাইবোন সেই মালা পরবো। জান্নাতে হাসিখুশির ফোয়ারা বইয়ে দেওয়া একটা উদ্যানে আবার সবাই একত্রিত হবো।

আমার ভাইকে সেই স্বপ্নে তাড়িত করতে চেয়েছি। সেই স্বপ্নে নির্ঘুম হয়ে যাবার নেশা জাগাতে চেয়েছি। কাবার রব্ব! তুমি আমার অব্যক্ত ভাবাবেগের পূর্ণতা দাও।

হাঁটতে হাঁটতে আরো কথা বলি। ওর কাছ থেকেও শুনি। নিজে ভাবনার খোরাক পাই ওর কথা থেকে। শিশু-কিশোরদের সরল জীবনোপলব্ধি, নিষ্পাপ চাহনির সহজ অভিব্যক্তির কাছে সবারই উচিৎ সময় করে একটু হাঁটুগেড়ে বসা।

আমি বলতে বলতে আরো কিছু যোগ করি। এই যে আব্বুম্মুর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ, এই বোধটাই পৃথিবীকে সুন্দর রাখে। শিক্ষকের প্রতি একজন ছাত্র কৃতজ্ঞ থাকে তাঁর জ্ঞান-প্রতীতির জন্যে। জীবনের পরিণত পর্যায়ে এসে ইচ্ছে করে শৈশবের

শিক্ষকদের কাছে ছুটে যেতে। কৃতজ্ঞতাবোধ মানুষে মানুষে মানবিক বন্ধন সংহত করে। আবার এই কৃতজ্ঞতাবোধ মানুষকে আল্লাহর কাছাকাছি করে। যাপিত জীবনে তাঁর যে অজস্র নেয়ামত আমরা ভোগ করে চলছি, আদিগন্ত করুণার আকাশে নিশ্চিন্ত বিহঙ্গ হয়ে উড়ছি, আমাদের অনিঃশেষ পাপগুলো নিমেষের পরিতাপে মুছে দিচ্ছেন, এজন্যে অবনত মস্তক বারবার সমর্পিত হওয়া কি উচিৎ নয়?

আমি ধরতে পারি, ওর ভাবনার সায়রে ঢেউ খেলতে শুরু করেছে। আমি উচ্ছ্বসিত হই। বিশ্বাসের সৌরভে বিমোহিত হবার আনন্দের চেয়ে বিশ্বাসের ফুল প্রস্ফুটিত হতে দেখার আনন্দ কোনো অংশে কম নয়।

নিজের সাথে কথা বলেও আমি এই অনুভবটাই বারবার আবিষ্কার করি মন-মুকুরে। জীবনের যা কিছু আরব্ধ, যা কিছু আরাধ্য, সবকিছু ঐ একজনের উদ্দেশ্যে নিবেদন করার মধ্যেই তো হৃদয়ের প্রশান্তি! পথ চলতে চলতে আযান শোনা যায়। নিকটস্থ মাসজিদে ঢুকে পড়ি দুই ভাই। নির্ধারিত ইমাম সম্ভবত আজ নেই, মুয়াজ্জিনের অনুরোধে ইমামের জায়গায় আমি দাঁড়ালাম। প্রথম রাকাতে যখন "ক্বুল ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন'[১] পড়ছিলাম, তখন বুক ভারী হয়ে আসতে চায়। কত ওজনদার কথা উচ্চারণ করছি মুখে! এই উচ্চারণকে যাপিত জীবনে সঞ্চারণ করতে পারি কতটুকু? আত্মজিজ্ঞাসু অন্তর এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলে নিরন্তর। নিজের কাছে। আমার কাছে।

---

১ কুরআনের আয়াত: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "আপনি বলুন: আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন এবং আমার মরণ বিশ্বজগতের রব্ব আল্লাহর জন্যে নিবেদিত।" [সূরা আল-আন'আম ৬:১৬২

পিপাসার গল্প প্রথম সংস্করণ অথবা ঈর্ষার গল্প দ্বিতীয় সংস্করণ

'জাগো গো ভগিনী' শীর্ষক প্রবন্ধগল্পে আমি একটা গানের কথা বলেছিলাম। নাফিস এখন যে বয়সে উপনীত, ঠিক এই বয়সেই গানটা আমার প্রিয় ছিলো। গানটা আমি ওকে শিখিয়েছিলাম বেশ আগে। আজকে আমাকে শোনালো:

জন্ম যদি হত মোদের রাসূল পাকের কালে
আহা রাসূল পাকের দেশে
মোদের তিনি কাছে টেনে চুমু দিতেন গালে
আহা কতই ভালোবেসে..

বেশ অনেকদিন পর সেই পুরনো ব্যথাটা আবার অন্যরকম শূন্যতা নিয়ে হাজির হোল আমার কাছে। খুব শৈশবে গানটা অবলীলায় গেয়ে যেতাম, পড়ন্ত কৈশোরে গাইতে গাইতে তন্ময় হতাম, আর তারুণ্যে এসে গানটার বাণী নীরবে চোখ ভেজায়। অনেকদিন সেরকম অনুভূতি হয় নি আমার। নাফিসের মায়াবী কণ্ঠ আমাকে আবার উদাস করে দিয়েছে, চোখ ঈষৎ আর্দ্র হলেও কোনো ফোঁটা গড়ায় নি; তথাপি ভেতরে অপ্রাপ্তির নদে সর্বগ্রাসী বান ডেকেছে বরাবরের মতোই। তার সাথে যুক্ত হয়েছে প্রচণ্ড ঈর্ষাবোধ।

প্রিয়নবীজির [ﷺ] সান্নিধ্যলাভে ধন্য সোনার মানুষগুলোর প্রতি ঈর্ষাবোধ আমার নতুন কিছু নয়। ইদানীং এই অনুভূতি ক্রমশ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। আর হবেই না বা কেন?

আমি আমার নবীজিকে [ﷺ] কত্ত কত্ত ভালোবাসি! অথচ তাঁর মুখ থেকে একটিবারের জন্যে 'তোমাকেও ভালোবাসি' কথাটা শোনবার সৌভাগ্য কি আমার হয়? যে সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর সাহাবী মু'আজ ইবন জাবাল [রা.]-এর? আহ্! কে জানে কেমন নিশ্চেতন করা অনুভূতি তাঁর হয়েছিল, যখন নবীজি [ﷺ] মু'আজের দুই হাত ধরে বলেছিলেন :

❝

يا معاذ والله إني لأحبّك والله إني لأحبّك

"এই যে মু'আজ! আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে ভালোবাসি! আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে ভালোবাসি![১]"

একবার নয়! দুইবার বললেন ভালোবাসার কথা। কতো গভীর ভালোবাসা! কী নিদারুণ সৌভাগ্য তাঁর! মু'আজ, আপনাকে আমার ঈর্ষা হয়, খুব, খুউব!

তারপর... আল-কুরআনকে আমি কত না ভালোবাসি! একটা দিন কুরআনের সাথে কিছু সময় না কাটালে আমার চলেই না। কোনো কোনো দিন ঝোঁকের বশে পুরোটা দিনই তার সাথে কাটিয়ে ফেলি। কুরআনের জ্ঞান-সমুদ্রের সৈকতে নুড়িকণা কুড়াই কী গভীর আগ্রহ আর মমতা নিয়ে, একদিন সেই সমুদ্র অবগাহনের স্বপ্ন দেখি বলে। অথচ আমার এই ভালোবাসায় বারাকাহ'র দু'আ করার জন্যে আমার পাশে নবীজি নেই! 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস কী সৌভাগ্যবান! আল-কুরআনের অনুসন্ধিৎসু এই মানুষটা পেয়েছিলেন নবীজির আন্তরিক দু'আ :

❝

اللهم علمه الكتاب

"আল্লাহ! একে তুমি কুরআনের জ্ঞানে প্রাজ্ঞ করো![২]"

আমার নামটাও তো আব্দুল্লাহ! কিন্তু আপনি সৌভাগ্যবান আব্দুল্লাহ! আমি তৃষ্ণার্ত আব্দুল্লাহ!

কুরআনের জ্ঞান চর্চার কথা বাদ দেই, কেবল কুরআন পাঠের কথা-ই না হয় ধরি। এই কাজ তো আমিও কত ভালোবাসা নিয়েই করি! আমার অপরিপক্ব ক্বিরাআত শুনে কত মানুষের দু'আ পেয়েছি। অথচ নবীজির [ﷺ] মুখ থেকে একটিবারের জন্যেও উৎসাহ

---

১ সুনান আবূ দাউদ: ১৫১৯

২ সাহীহ আল-বুখারী: ৭৫। মুসনাদ আহমাদ: ৩৩৭৯। আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খ. ৮ পৃ. ৩২৭।

পাই নি, পাই নি দু'আ। আবূ মূসা আল-আশ'আরীকে যখন রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন :

❝

لو رأيتني و أنا أستمع لقراءتك البارحة

"গতরাতে তোমার ক্বিরাআত যখন আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম, তখন যদি আমাকে তুমি দেখতে![১]"

আবূ মূসার হৃদয়ে কী অনন্য দ্যোতনার হিন্দোল বয়েছিলো, কে জানে! আচ্ছা, আমি যদি সে সময় জন্ম নিতাম, মায়াভরা কণ্ঠে কুরআন পাঠ করতাম, আমাকেও কি নবীজি [ﷺ] এমন একটু ভালোবাসাপ্রাণিত উৎসাহ দিতেন না? আমার ক্বিরাআত না হয় সেরকম ভালো নয়, কিন্তু আমি যে তাঁর মুখ থেকে এমন একটা কথা শোনার জন্যে পাগলপ্রায়, এ কথা জানার পর নবীজি [ﷺ] কি সান্ত্বনার জন্যে হলেও আমাকে একটু ভালোবাসার জানান দিতেন না!? দিতেন, নিশ্চয়ই দিতেন! আমার নবীজি তোমাদের মতো না তো!

তারপর উবাই ইবন কা'ব-এর কথা-ই ধরি। এই মানুষটাকে রাসূলুল্লাহ [ﷺ] যখন বললেন[২] :

❝

إنّ الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البيّنة

"আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেন তোমাকে সূরাহ আল-বায়্যিনাহ পাঠ করে শোনাই।"

আনন্দে উদ্বেল হয়ে আবেগাপ্লুত উবাই বললেন :

آلله سمّاني لك

"আল্লাহ কি তবে আপনাকে আমার নামটি বলেছেন!?[৩]"

উবাই! রদ্বিয়াল্লাহু 'আনকা। আপনি কী সৌভাগ্য নিয়ে এসেছিলেন এই জমিনে? আল্লাহ আপনার নাম নিয়েছেন, নবীজি [ﷺ] আপনার জন্যে কুরআন পাঠ করছেন! আপনাকে আমি খুব বেশি ঈর্ষা করি!

---

১ সাহীহ মুসলিম: ১৯৩

২ সাহীহ আল-বুখারী: ৩১৮৪। সাহীহ মুসলিম: ২৪৮৫। সুনান আন-নাসাঈ: ৭১৬।

৩ প্রাগুক্ত

কবিতার সাথে কত পথ হেঁটে এলাম আমি! এই নিষ্ফলা জমিনের বুকে উদয়াস্ত বিশুদ্ধতার চাষ করে গেছি। সে ফসল ফেরি করে বেড়াই তিলোত্তমা নগরীর বুকে। অথচ এখানেও আমি তৃষ্ণার্ত ভীষণ! হাসসান ইবন সাবিত-এর মত আমার নবীজি [ﷺ] থেকে একটু ভালোবাসা, একটু দু'আ আমার ভাগ্যে জোটে নি।

❝

اللهم أيده بروح القدس

"হে আল্লাহ! তুমি হাসসানকে রূহুল কুদস (জিবরীল) এর মাধ্যমে সাহায্য করো![১]"

হাসসান-কে ভালোবেসে তাঁর কবিতা আবৃত্তির জন্যে রাসূলুল্লাহ [ﷺ] নিজের পাশে একটি আবৃত্তিমঞ্চ গড়ে দিয়েছিলেন! সেসব চিন্তা করলে মাঝে মাঝে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় পাওয়া পুরস্কার-ক্রেস্টগুলো, কবিতা লিখে পাওয়া ভালোবাসাগুলো, নিজের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবার আনন্দ ও গৌরব— সবকিছু অর্থহীন মনে হয়। আমি যদি সে সময় থাকতাম, আমাকে তেমন কোনো সুযোগ না দেওয়া হোক, তেমন মর্যাদা না দেওয়া হোক, অন্তত আমার কবিতা শুনে নবীজির [ﷺ] মুখ থেকে একটা অমিয় হাসি দেখার সৌভাগ্য তো পেতাম।

রাসূলের সান্নিধ্যলাভে ধন্য হে আলোর পাখিরা!

রদ্বিয়াল্লাহু 'আনকুম।

আমি তোমাদের ঈর্ষা করি বলে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না। ঈর্ষার চেয়ে আমি তোমাদের ভালোবাসি বেশি।

তোমাদের সাথে, প্রিয়তম রাসূলের সাথে ফিরদাউসের বাগিচায় যেদিন দেখা হবে (ইন শা-আল্লাহ), সেদিনের আগ পর্যন্ত আমি তৃষ্ণার্ত-ই রবো।

---

১ সাহীহ আল-বুখারী: ৪৫৩। সাহীহ মুসলিম: ৯৯৯।